দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

'অ্যাডভান্টেজ বিজেপি' পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বইছে গেরুয়া ঝড়
— পৃঃ ১৪

সঙ্ঘ এবং রাজনীতি
— পৃঃ ২৬

৭১ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ১৩ মে ২০১৯।। ২৯ বৈশাখ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড়

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২৯ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৩ মে - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ঘৃণার রাজনীতির বাইরে বেরোতে না পারলে সমূহ বিপদ ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদির ভাইপোর বাড়ি নেই, বাড়ি ভাড়ায় আয় আছে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

শ্রীলঙ্কায় বিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলায় ভারতের নিশ্চিন্ত থাকার কোনও কারণ নেই ▯ পবন ভার্মা ▯ ৮

ভোটের হারে পশ্চিমবঙ্গে বড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

গণতান্ত্রিক মূলবোধের অজ্ঞানতায় ইত্যাকার অশিষ্টাচারের জন্ম ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৩

‘অ্যাডভান্টেজ বিজেপি’ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বইছে গেরুয়া ঝড় ▯ সনাতন রায় ▯ ১৪

উপচে পড়ছে জনসভা, রাজ্যে এবার মোদী ঝড় ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

রাজনৈতিক ক্যাডারদের বোধবুদ্ধির উদয় হোক ▯ রাজু সরখেল ▯ ১৮

দিদি চান বা না চান দিন বদলাবেই ▯ অমর ভৌমিক ▯ ২৪

সঙ্ঘ এবং রাজনীতি ▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ২৬

গৌতম বুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শন ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

সোশ্যাল মিডিয়ার চাপে সোনির ডিগবাজি ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ৩৫

ইসলামিক স্টেটের হুমকি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অশনিসংকেত ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য ▯ ৩৬

অমরকোটের রূপকথা ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ৩৮

পাঁচমিশালি সরকার গঠনের ঝুঁকি মানুষ নেবেন না ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ৪০

তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তফাত শুধু শিরদাঁড়ায় ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ৪৫

ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানপ্রেম ▯ বিমলেন্দু ঘোষ ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯

সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২০ মে ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভোটসন্ত্রাসে সেরা পশ্চিমবঙ্গ

এবারের লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণের পর একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভোট-সন্ত্রাসের নিরিখে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গই সেরা। নির্বাচনের প্রথম দিন থেকে তৃণমূলের জল্লাদবাহিনীর সন্ত্রাস অব্যাহত। বিরোধী দলের কর্মী-নেতাদের ওপর আক্রমণ, এমনকী প্রার্থীদের হেনস্থা করা, বোমাবাজি, বুথদখল, ছাপ্পা ভোট সবই চলছে যথারীতি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও শাসক দল এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্যগুলো থেকে এগিয়েই রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে— ভোট-সন্ত্রাস কি পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হবে না? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই নিয়েই বিশেষ আলোচনা করবেন লেখকরা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অশনি সংকেত

ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের উৎসব লোকসভা নির্বাচন চলিতেছে। ইহারই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর হুমকি রাজ্যবাসীকে শঙ্কিত করিয়াছে। তাহারা তাহাদের ওয়েবসাইটে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দিতে একটি পোস্টার ছাড়িয়াছে। তাহাতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের হোলি আর্টিজানে হামলাকারী পাঁচ জঙ্গির ছবি-সহ বাংলা ও ভারতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হুমকি প্রদান করিয়াছে। পোস্টারের নীচে লিখিয়াছে ‘ কামিং সুন, ইনশা আল্লা’। গোয়েন্দা দপ্তরের অনুমান এই হুমকি নাকি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতকে। বাঙ্গলায় নাশকতার জন্য তাহারা নূতন নেতাও ঘোষণা করিয়াছে। বস্তুত, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতেই ভারত জেহাদি হামলায় জর্জরিত। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনকালে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে তাহারা উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে নরম মনোভাব পোষণ করিয়াছে। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনকালে তাহাদের প্রশ্রয়ে জেহাদি ও সমাজবিরোধী শক্তি পশ্চিমবঙ্গকে নিরাপদ আশ্রয় রূপে ব্যবহার করিয়াছে। অনুপ্রবেশ ও জেহাদি তৈরির আঁতুরঘর মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে কদাচিৎ তাহারা গর্জিয়া উঠিলেও ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রাখিয়া চুপ থাকিয়াছে। বর্তমানে তৃণমূল শাসনকালে তাহাদের প্রত্যক্ষ মদতে জেহাদি গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গকে বারুদের স্তূপের উপর রাখিয়াছে। ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি, নদীয়ার জুড়ানপুর, মালদহের কালিয়াচক, হাওড়ার ধুলাগড়ে তাহারা তাহাদের মহড়া সারিয়া লইয়াছে।

আইএসের এই হুমকি সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও অশনি সংকেত। মাত্র দেড় দশক পূর্বে এই ভাবেই কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করা হইয়াছে। তাহাতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ও রাজ্যের শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদতও ছিল। দেশের সুরক্ষা লইয়া তাহারা বার বার আপোশ করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় যে প্রাণঘাতী জঙ্গি হামলা হইয়াছে, তাহা ন্যাশনাল তওহিদ জামাত নামে সংগঠনের আড়ালে আইএস সংঘটিত করিয়াছে। আইএস ইহার দায় স্বীকার করিয়াছে। শ্রীলঙ্কার সেনাপ্রধান দাবি করিয়াছেন যে, হামলাকারী জঙ্গিরা ভারতের কাশ্মীর, কর্ণাটক ও কেরলের কোথাও প্রশিক্ষণ লইয়াছে। দুঃখের বিষয় হইল, ২০১০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং ইউপিএ চেয়ার পার্সন সোনিয়া গান্ধী মুসলমানদের সংরক্ষণের বিষয়ে কথা বলিবার জন্য এই ন্যাশানাল তওহিদ জামাত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রবীণ কংগ্রেসি নেতা দিগ্বিজয় সিংহকেও জঙ্গিবাদের প্রবক্তা জাকির নাইককে উৎসাহিত করিতে দেখা গিয়াছে। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের লোভে ইহারা দেশের সুরক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়া দেশবিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করিয়াছে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদের নেতা মাসুদ আজহারকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণা বর্তমান মোদী সরকারের একটি বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য। নরেন্দ্র মোদীই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকে একজোট করিয়াছেন। একমাত্র চীন ছাড়া বিশ্বের সব দেশ মোদীর কথা মানিয়া লইয়াছে। ধীরে ধীরে চীনকেও মানিতে হইতেছে। ভারতকে সন্ত্রাস মুক্ত করিতে মোদী সরকার সংকল্প করিয়াছে— ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ বিলোপ করা হইবে। নকশালবাদ ও মাওবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। সারা দেশে এনআরসি চালু করিয়া অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করা হইবে। তাহারা ইতিমধ্যে জঙ্গি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে স্বাধীনতা দিয়াছে। বিমানবাহিনীর জওয়ানরা শত্রুদেশে প্রবেশ করিয়া জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করিয়াছে। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সুরক্ষা ও সুযোগসুবিধা রদ করিয়াছে। হিজবুল নেতা সালাউদ্দিনের ১৩ টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। জাকির নাইকের ৫১ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদী সরকারের এই পদক্ষেপ ও লড়াইকে সারা বিশ্ব সম্মান জানাইয়াছে। আইএস হুমকির এই রূপ কঠিন সময়ে দেশবাসীকে বিশেষ করিয়া বঙ্গবাসীকে মোদী সরকারকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত করিতেই হইবে। নতুবা কাশ্মীরের পণ্ডিতদিগের অবস্থার ন্যায় হিন্দু বাঙ্গালিদের তৈরি থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।

ফলং পাপস্য নেচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ।।

মানুষ পুণ্যফল লাভ করতে চায়, কিন্তু পুণ্য কাজে ইচ্ছা থাকে না। পাপের ফলভোগ করতে চায় না, কিন্তু পাপ কাজ যত্নের সঙ্গে করে থাকে।

ঘৃণার রাজনীতির বাইরে বেরোতে না পারলে সমূহ বিপদ

স্বস্তিকার আগের একটি সংখ্যায় ঘৃণার প্রচারকারীদের অর্থাৎ হেট ক্যাম্পেনারদের সম্বন্ধে লিখেছিলাম। আজ সামগ্রিকভাবে হেট ক্যাম্পেন অর্থাৎ ঘৃণার প্রচার সম্পর্কে বলব। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভোট-প্রচার ভিডিয়োতে দেখা যায় তিনি ভোটারদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন বিজেপিকে রুখতে কেবল তাঁর দলকেই ভোট দিন, কংগ্রেস-সিপিএমকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন না। কারণ এই দুই দল জিততে তো পারবেই না, বরং এদের ভোট দিলে তৃণমূলের ভোট কমে যাওয়ার কারণে বিজেপি জিতে যেতে পারে। চৌত্রিশ বছরের বাম আমলে আমরা একটা চিত্র দেখেছিলাম, কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতে বামপন্থীদের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

তখন বলা হতো, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দক্ষিণপন্থীদের একজোট হতে হবে। মুসলমান ভোট লালায়িত মমতা তাঁর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গী বিজেপিকে মুহূর্তের মধ্যে নস্যাৎ করে, তাঁর বহু আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক শত্রু কংগ্রেসিদের হাত ধরে সিপিএমকে বাঙ্গলা ছাড়া করেছিলেন, রাজ্যের মানুষও তখন যেন-তেন-প্রকারে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দলীয় মতের ঊর্ধ্বে উঠে এই জোটকেই বিকল্প বলে মেনে নিয়েছিলেন। মমতা আজ যখন বিজেপির বিরুদ্ধে এই একই নীতি নিতে যাচ্ছেন, তখন অঙ্কের হিসেবে প্রচুর গরমিল হচ্ছে। সিপিএম শেষ পর্যন্ত একটি নিন্দনীয়, ঘৃণিত সত্তায় পরিণত হয়েছে, আর বিজেপি এখনও হিন্দুদের আস্থা ও মর্যাদার একমাত্র প্রতীক হিসেবে গণ্য। বাম আমলের অত্যাচার, আর বিজেপির আমলে ভারতীয়দের সুরক্ষা, স্বদেশ অস্মিতা— এই দুই শাসনের নরক ও স্বর্গের রূপ দেখিয়ে দিয়েছে।

ফলে সেদিন বিরোধী নেত্রী হিসেবে উজ্জ্বল ভাবমূর্তির অধিকারিণী মমতা যে ফয়দা লোটার সুযোগ পেয়েছিলেন, আজ শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নগ্ন মুসলমান তোষণ, সেনা-বিরোধিতা, দেশদ্রোহিতা, আর্থিক দুর্নীতি— এরকম

বিশ্বামিত্রের কলম

নানা কলঙ্কে জড়িয়ে তিনি একমাত্র শত্রু বিবেচনা করেছেন বিজেপিকে, আরও ভালোভাবে বললে নরেন্দ্র মোদীকে। তাই কংগ্রেস সমর্থক-বাম সমর্থকের দরজাতেও তাঁকে কড়া নাড়তে হয়। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বহুত্ববাদের প্রথম পূজারি অটলবিহারী বাজপেয়ী দেখিয়েছিলেন একান্ন শতাংশ মানুষের মতদানই গণতন্ত্রের কাঠামোয় শেষ কথা বটে কিন্তু বহু স্বরের অনুরণন তখনই সম্ভব যদি ওই একান্ন শতাংশের মাধ্যমে একশো শতাংশতেই মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

এনডিএ গঠনের মাধমে জোট রাজনীতির যে মাপকাঠি অটলজী আজ থেকে কুড়ি বছরেরও বেশি সময় আগে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, পরে দশ বছর যে রাজনীতিকে মানতে বাধ্য হয়েছিল ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভুত্ব করা কংগ্রেস, আজ বিজেপি বিরোধিতায় নেমে সেই রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে কীভাবে কলুষিত করা হচ্ছে মায়া-অখিলেশ, চন্দ্রবাবু-মমতা- লালুপ্রসাদ-রাহুল গান্ধীরা দেখিয়ে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কারোর সঙ্গে কারো মিল নেই, জোটধর্ম পালনের ন্যূনতম সদিচ্ছা কারোর নেই, তাই একদিকে দেখি উত্তরপ্রদেশে মায়া- অখিলেশের জোটে কংগ্রেস ব্রাত্য, পশ্চিমবঙ্গে মমতা একাই বিয়াল্লিশ (প্রার্থীপদের নিরিখে), কংগ্রেস-সিপিএমের মুখ দেখাদেখি এরাজ্যে বন্ধ, আবার অন্ধ্রে কিংবা দিল্লিতে কংগ্রেসের প্রতিযোগী চন্দ্রবাবু বা কেজরি, কেরলে আবার সরাসরি রাহুল বনাম বামেদের লড়াই। অথচ এরাই ব্রিগেডে হাত ধরাধরি করে বার্তা দিতে চায় 'আমরা বিজেপির বিপক্ষে'।

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লড়াইয়ে নেমে বিজেপির বিরুদ্ধে ঘৃণাই এদের মূলধন। তাই ভারতীয়দের জুজু এদের দেখাতেই হবে, সে গো-ভক্ষণের অজুহাতেই হোক কিংবা এনআরসি, সে উগ্র প্রাদেশিকতা বা হিন্দি বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতার মোড়কেই হোক বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। টুকরে টুকরে গ্যাং বিশ্বের কাছে নিজেদের আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রমাণ করতে চায়, অথচ এদের স্লোগানেই থাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ আর বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের ইন্ধন। সংসদীয় কাঠামোয় এই যে একটি দলের বিরুদ্ধে ঘৃণা— আর যাই ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

এর পেছনে নেহরুবাদের অনেকটা অবদান আছে। যে মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের ইতিহাস-রচনাকে দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল, আজ তাদেরই মূল ধারার ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে সমাদর করা হচ্ছে। নেহরুবাদ মুছে গেলে, পরিবারতন্ত্র অবলুপ্ত হলে যে ভারতের স্বাভিমান আবার জাগ্রত হবে, ধান্দাবাজির রাজনীতিতে বিশুদ্ধতার ছোঁয়া লাগবে, এটা মানতে অনেক রাজনীতিকেরই অসুবিধা হচ্ছে, তাই ঘৃণার আমদানি। ▮

দিদির ভাইপোর বাড়ি নেই, বাড়ি ভাড়ায় আয় আছে

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

নিজের কোনও গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, জমি কিছুই নেই বলে হলফনামায় উল্লেখ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর আয়ের উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন বেতন ছাড়াও বাড়ি ভাড়া বাবদ রোজগার। এমনটাই বলছে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তাঁর হলফনামা। সেখানে আরও জানিয়েছেন স্ত্রী রুজিরার সোনা রয়েছে ৬৫৮ গ্রাম আর রুপো আড়াই কেজি।

যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিলেন বুধবার। আর সেই সঙ্গে নিয়ম মতো জমা দিলেন নিজের ও পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব। একই সঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কী কী সম্পত্তির হিসেব ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো।

অভিষেকের হাতে নগদ রয়েছে ৯২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়াও পাঁচটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ, বিভিন্ন বিনিয়োগ ও সোনা, রুপোর বাজার দর মিলিয়ে মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৭১ লাখ, ৪০ হাজার ৭৩৯ টাকা ৪৫ পয়সা। স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্থাবর সম্পত্তি ৩৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯১৫ টাকা ৪৮ পয়সা ও মেয়ে আজানিয়ার ৩০ লাখ ৯৭ হাজার ৬৪৪ টকা ৭৪ পয়সা। সব মিলিয়ে পারিবারিক অস্থাবর সম্পত্তি ১ কোটি ৩৭ লাখ ৯৪ হাজার ৩১৯ টাকা ৬৭ পয়সা।

সম্প্রতি কলকাতা বিমানবন্দরে সোনা সংক্রান্ত বিতর্কে জড়ান অভিষেক পত্নী রুজিরা। সম্পত্তির হিসেবে অভিষেক জানিয়েছেন স্ত্রীর মোট সোনার পরিমাণ ৬৫৮ গ্রাম ও রুপো আড়াই কেজি।

এর পরে নিজের স্থাবর সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে অভিষেক জানিয়েছেন তাঁর বা স্ত্রী রুজিয়ার কোনও জমি, বাড়ি কিছু নেই। ফ্ল্যাটও নেই। কোনও রকম কোনও দেনাও নেই। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামায় অভিষেক তাঁর ঠিকানা হিসেবে জানিয়েছেন কালীঘাটের ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এই বাড়িতেই থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ভোটপ্রার্থীর বার্ষিক আয়ের হিসেবও দিতে হয়। অভিষেক জানিয়েছেন, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে তাঁর আয় ছিল ৭৫ লাখ ৩ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। অন্য দিকে, স্ত্রীর আয় ১ কোটি ৫১ লাখ ৬১ হাজার ১৫০ টাকা।

কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় গত পাঁচ বছরে কী হারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তাও জানিয়েছেন অভিষেক। তাতে দেখা যাচ্ছে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে বার্ষিক আয় ছিল ৩৬ লাখ টাকা। সেটাই বেড়ে ৭৫ লাখ টাকা হয়েছে। অন্য দিকে, স্ত্রী রুজিরার বার্ষিক আয় গত পাঁচ বছরে ৪৬ লাখ থেকে বেড়ে দেড় কোটি টাকা হয়েছে।

স্বামী স্ত্রী দু'জনের আয় বাড়লেও পাঁচ বছরে অভিষেকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কমেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া হলফনামায় অভিষেক মোট সম্পত্তি জানিয়েছিলেন ১ কোটি ৫১ লাখ ৯৯ হাজার ২৭২ টাকা। সেটা কমে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা হয়েছে।

পাঁচ বছর আগে কলকাতার পণ্ডিতিয়া রোডে একটি ১১৭৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জন্য তিনি ৩০ লাখ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। তবে এবারের হলফনামায় তার কোনও উল্লেখ নেই।

এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো। সুতরাং, তাঁর বাড়ি না থাকলেও বাড়িভাড়া থেকে আয় হতেই পারে। তিনি পিসির কুঁড়েঘরেই থাকেন। শান্তিনিকেতন নামে কলকাতার প্রাসাদোপম বাড়িটাও আসলে মিথ্যা। পুরো মিথ্যে।

—সুন্দর মৌলিক

শ্রীলঙ্কায় বিধ্বংসী সন্ত্রাসী হামলায় ভারতের নিশ্চিন্ত থাকার কোনও কারণ নেই

অতিথি কলম

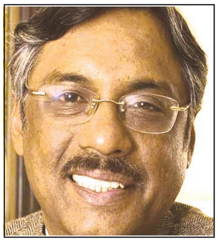

পবন ভার্মা

গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় যিশুর বার্ষিক মরণোত্তর প্রার্থনা সভায় রত একটি শান্ত সমাহিত সকালকে আচম্বিতে অতি সুনিয়ন্ত্রিত অসংখ্য সন্ত্রাসী বোমা বর্ষণে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। তিনটি প্রার্থনাগৃহ ও তিনটি হোটেলে এই হামলা চালানো হয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ২৫৩ জন মৃতের মধ্যে ১৩ জন ভারতীয়-সহ বহু বিদেশি রয়েছেন। আরও অসংখ্য মানুষ আঘাত পেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এত বড়ো আকারের সন্ত্রাসী হামলা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় আগে কখনও ঘটেনি।

ইসলামিক স্টেট এই মারাত্মক আক্রমণের দায় নিয়েছে। অবশ্যই এদের জড়িয়ে থাকার অসংখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণও রয়েছে। প্রথমত বিস্ফোরণের বিশালতা, ব্যবহৃত বিস্ফোরকের পরিমাণ, সর্বোপরি উপর্যুপরি নানা স্থানে বিস্ফোরণের মধ্যে একটা বীভৎস খুনি মানসিকতার প্রকাশ। এছাড়া এত বড়ো মাত্রার আক্রমণ ভিন্ন দেশে গিয়ে সফল করতে গেলে যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় তা আই এস-এর নৃশংস জিহাদি যুদ্ধবাজরা ছাড়া কখনই অন্য কারও সংঘটিত করা সম্ভব নয়। আক্রমণকারী 'সালাফি জিহাদিরা' স্বঘোষিত খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠায় এক মরিয়া গোষ্ঠী। এরা সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।

আশ্চর্যের বিষয়, আই এস-এর এই ধরনের পাশবিক কাজ করতে আলাদা করে কোনো মানসিক অনুপ্রেরণার দরকার হয় না। তাদের কাছে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও যারা বিশ্বব্যাপী আই এস-এর চরমপন্থী ইসলামীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কুচিন্তার পক্ষে নয় তারাই তাদের শত্রু। শ্রীলঙ্কা সরকারের তরফে বলা হয়েছে সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের প্রত্যাঘাত হিসেবেই এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। দুটি স্থানীয় ইসলামিক জঙ্গি-সংগঠন 'ন্যাশন্যাল তওহিদ জামাত' ও 'জামায়েতুল মিলাসু ইব্রাহিম'-এর ওপর কড়া সরকারি নজর রয়েছে।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে গোয়েন্দা দপ্তরের আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীরা অবলীলায় হামলা চালাল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি চাকরি থেকে অপসারিত শ্রীলঙ্কার পুলিশ প্রধান পূজিত জয়সুনন্দর গত ১১ এপ্রিল তাঁর দপ্তরের অফিসারদের সতর্ক করে জানিয়েছিলেন— দেশের গুরুত্বপূর্ণ চার্চগুলি ও ভারতীয় হাই কমিশন অফিসকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভারতের তরফ থেকেও নিশ্চিত সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটার সম্ভাবনার কথা শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছিল। এই বছর জানুয়ারি মাসেই শ্রীলঙ্কার পুলিশ একটি বন্যপ্রাণী সংগ্রহশালার আড়াল থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও ডেটোনেটর উদ্ধার করেছিল।

এখন প্রশ্ন, পূর্বাহ্নে এতটা সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও দেশের তদন্তকারী সংস্থা আক্রমণ ঠেকাতে কেন ব্যর্থ হলো? এই সূত্রে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি সিরিসেনা উদ্বেগজনকভাবে জানিয়েছেন এই ধরনের আশঙ্কার খবর সংস্থাগুলি তাঁকে দেয়নি।

তাহলে, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যদি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে পড়শী দেশ হিসেবে ভারতের কী শিক্ষা নেওয়া উচিত?

ভারত কিন্তু এই আই এস নামের জিহাদি জঙ্গি-সংগঠনের নজরে রয়েছে। বলা বাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারত এদের চক্ষুশূল। শুধু তাই নয় ভারতে যে গর্ব করার মতো বিশাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিদ্যমান আই এস তারও ঘোর বিরোধী। তাদের মতে যে সমস্ত ধর্ম গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাদের সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। বুঝতে অসুবিধে হয় না শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন তাই হিটলিস্টে ছিল। এই ঘটনা কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থাটা কিন্তু সেইভাবে এখনও সংহত নয়। অনেকগুলি তদন্তকারী সংস্থা কর্মরত রয়েছে। এরা আবার অনেক সময় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ফলে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার ক্ষেত্রে সম্মিলিত আগাম প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে।

এই সূত্রে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কথা বোঝা দরকার। এই সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থাটিই দীর্ঘদিন ধরে কর্মী স্বল্পতায় ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে ভুগছে। National Technical Research Organisation (NTRO) ২০০৮ সালে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় এর মূল লক্ষ্য ছিল গোপন খবর সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেওয়ার। কিন্তু দপ্তরটি কাজের উৎকর্ষসীমা ছুঁতে পারছে না। অন্যদিকে ২০০৮ সালে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বা গতিবিধি নিয়ে খবরাখবর সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় তদন্ত চালানোর কাজে তৈরি হয় National Investigation Agency (NIA)। এই সংস্থার কিন্তু তেমন দম নেই। তার একটি মারাত্মক কারণ হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে নির্দিষ্ট তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজ্য পুলিশের কর্তারা এঁদের তদন্ত চালানোকে নাক গলানো বা অনধিকার চর্চা বলে মনে করেন। এর ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে সে কথা আলাদা। রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজের সক্ষমতা আদৌ উচ্চমানের নয়। অধিকাংশ লোকই হয় সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নয়তো ভিআইপি-দের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজেই নিযুক্ত থাকে। কার্গিল যুদ্ধের পর ১৯৯৯ সালে মাল্টি এজেন্সি সেন্টার তৈরি হয়। এদের দায়িত্ব ছিল অন্যান্য সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি অত্যন্ত ক্ষুরধার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা। কিন্তু বাস্তবে বাকি সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্মের প্রথামাফিক রিপোর্ট পর্যন্ত এই মূল নিয়ামক সংস্থার কাছে দাখিল করার প্রয়োজন মনে করে না।

> “পাকিস্তানের কল্যাণে ভারতে সন্ত্রাসবাদের ভয় সর্বদাই বজায় থাকবে। আর শ্রীলঙ্কার ঘটনা সতর্ক করে দিচ্ছে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যে চোখ, কান খোলা রেখে সর্বশক্তিতে প্রস্তুত থাকতে হবে— নইলে সর্বনাশ।”

The Nat Grid নামে যে সর্বভারতীয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত খবরাখবর আদান প্রদান কেন্দ্র দেশব্যাপী খোলার পরিকল্পনা ২০০১ সালে নেওয়া হয়, তা ২০০৮ সাল অবধি ঠাণ্ডা ঘরেই পড়েছিল। এখনও পর্যন্ত তা পুরোদমে কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

The Defence Intelligence Agency (DIA) ২০০২ সালে বাজপেয়ীর আমলে চালু হলেও একজন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মুখ্য অধিকর্তার অভাবে এই সংস্থারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। The National Security Council (NSC) বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ যার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রীসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা (Cabinet Committee on Security) ও National Secqurity Adviser (জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) এঁদের মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ প্রায় হয়ই না। রাজ্যগুলির নানা ধরনের আপত্তির ফলে National Counter Terrorism Centre-এর কাজের পরিধি ও ক্ষমতা প্রায় খর্বই করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে এই সংস্থাগুলি যে কাজই করুক না কেন তা তারা একেবারে নিজেদের নিজস্ব ঘেরাটোপের মধ্যে করে থাকে। যে এনএসএ-এর মুখ্য কোঅর্ডিনেটেরের ভূমিকা পালন করার কথা তার হাত সদাই নিজের কাজে এতই ভর্তি থাকে যে অন্যদিকে দেওয়ার মতো সময়ই থাকে না। এই কারণেই অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের এপ্রিল ২০১৭ সালে দেওয়া রিপোর্টে বলেছে “there is no single unified authority to coordinate the operation of these agencies and ensure a quick response in crisis like 26/11।”

আই এস বর্তমানে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেলেও সদ্য ঘটে যাওয়া শ্রীলঙ্কার নৃশংসতা প্রমাণ করল তারা যথারীতি বেঁচেবর্তে আছে। মধ্যে আফগানিস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের আঠারোটি দেশে তাদের শাখা সংগঠনও চালাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এদের হাতে রয়েছে অগাধ টাকা। এবার এরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকছে, এমনকী ছোট্ট মালদ্বীপও বাদ যাচ্ছে না।

যাইহোক, পাকিস্তানের কল্যাণে ভারতে সন্ত্রাসবাদের ভয় সর্বদাই বজায় থাকবে। আর শ্রীলঙ্কার ঘটনা সতর্ক করে দিচ্ছে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যে চোখ, কান খোলা রেখে সর্বশক্তিতে প্রস্তুত থাকতে হবে— নইলে সর্বনাশ। ■

রম্যরচনা

জীবনের শিক্ষা

আমি একদিন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম— এ জীবনকে কে পথ দেখাবে?

আমার ঘরের ছাদ উত্তর দিল— লক্ষ্য উঁচু রাখো।

পাখা বলল— মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

ঘড়ি বলল— সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শেখ।

দেওয়ালের ক্যালেন্ডার বলল— সবসময় নিজেকে আপডেট রাখো।

ব্যাগ বলল— ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করো।

দেওয়াল বলল— অন্যের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নাও।

জানালা বলল— দৃষ্টি প্রসারিত করো।

মেঝে বলল— মাটির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করো।

খাট বলল— অন্যের ভার বহন করতে শেখ।

বিছানা বলল— আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ।

উবাচ

“‘জয় শ্রীরাম’ বললেই দিদি রেগে যান, সবাইকে জেলে পোরেন। স্পিড ব্রেকার দিদি দুর্যোগ নিয়েও রাজনীতি করতে ছাড়েন না।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

তমলুকে নির্বাচনী জনসভায়

“একটি মহাচোরবন্ধন তৈরি হয়েছে। সেখানে একটি ফ্রেমেই ভারতবর্ষের যত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে পেয়ে যাবেন। তারা স্বপ্ন দেখছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বানাবেন। নিজেদের মধ্যে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদ ভাগাভাগি করে নেবেন।”

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্যে

“মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘লা ইল্লাহা মহম্মদ রসুল আল্লাহ’ বলেন, অথচ রামনাম সহ্য করতে পারেন না। এদেশটা কি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান হয়ে যাচ্ছে?”

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
ক্ষেত্রীয় সংগঠন

চন্দ্রকোনায় মুখ্যমন্ত্রীর জয় শ্রীরাম শুনে রেগে যাওয়া প্রসঙ্গে

“প্রিয়াংকা গান্ধী পাঁচ বছর আমার নামই জানতেন না। এখন নিজের স্বামীর নাম কম, আমার নামই সবসময় নিচ্ছেন।”

স্মৃতি ইরানি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আমেথিতে নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে

“বিপক্ষের প্রার্থী সম্বন্ধে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। আমার মতে নির্বাচন ইস্যুভিত্তিক হওয়া উচিত,” ব্যক্তিভিত্তিক নয়।

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

ভোটের হারে পশ্চিমবঙ্গে বড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে

সাধন কুমার পাল

প্রশাসনিক মেশিনারি ব্যবহার করে খোদ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হিংসায় মদত দান, ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ উঠছে। বলাই বাহুল্য রাজ্যটির নাম তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় ডি নায়েকের মতে ১০/১৫ বছর আগে বিহারে এরকম পরিস্থিতি ছিল। তখন ওই রাজ্যেও নির্বাচনের সময় সবাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলতো। শুধু মাত্র নির্বাচন ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে বিশেষ পর্যবেক্ষকের বক্তব্যে কোনো ভুল নেই। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে বলতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা সুরাবর্দি শাসিত ৪৬ সালের অবিভক্ত বাঙ্গলার মতো। অথবা আটের দশকের ফারুক আবদুল্লা শাসিত কাশ্মীরের মতো। সে সময় ফারুক আবদুল্লার মদতে জম্মু-কাশ্মীর সরকার এমন ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিল যে ভূমিপুত্র কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভিটে ছাড়া হতে হয়েছে, নৃশংস ভাবে খুন হতে হয়েছে। মা-বোনদের ধর্ষিতা হতে হয়েছে।

এরকম মনে হতে পারে নির্বাচন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, এই সময় অনেক ঘটনাই ঘটে। এই সমস্ত ঘটনাকে দেশভাগের বা কাশ্মীর পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা কি বাড়াবাড়ি নয়? ঠাণ্ডা ঘরে বসে যারা লেখালেখি করেন তাদের কাছে এই ধরনের তুলনা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে নেমে এলে দেখা যাবে ইসলামিক কট্টরপন্থীরা এবার কোনো ইসলামিক সংগঠন বা মুসলিম লিগের পতাকা নয়, মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলের পতাকা নিয়ে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ ভোটদানের জন্য সক্রিয় ভাবে প্রচার করেছে, আবার যেখানে ক্ষমতায় কুলিয়েছে সেখানেই হিন্দুদের ভোট দানে বাধা দিয়েছে।

দেশভাগের সময় সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যে নির্বাচন হয়েছিল তাতেও ঠিক এই ধরনের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চোখে পড়েছিল। সে সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে কোনো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা থাকলে তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণভোটের দাবি উঠেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম সিলেট জেলা। জিন্নাপন্থীরা দাবি তুললেন সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট নিতে হবে। অসমের তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই দাবি মেনে নিলেন। ঠিক হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই গণভোট হবে। এই ভোটকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের গুন্ডারা দাঙ্গা বাঁধিয়ে এমন ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করল যে ভারতের পক্ষের ভোটদাতারা ভোটকেন্দ্রেই পৌঁছুতে পারলেন না। ভোটের দুই দিন সমগ্র সিলেট জুড়ে মুসলমান গুন্ডারা অবাধ রাজত্ব চালালেও কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলই নেতত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন ছিল নির্বাক দর্শক। সিলেটের দু' লক্ষ চা-শ্রমিক যারা অসম বিধান পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে তাদের ভোট দান থেকে বঞ্চিত রাখার দাবিও মেনে নেওয়া হলো। এক্ষেত্রে মুসলিম লিগের যুক্তি ছিল যে চা শ্রমিকরা ভাসমান নাগরিক, সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের ভূমিকা থাকতে পারে না। সেদিনের সেই প্রহসনের গণভোটে ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে সিলেট পাকিস্তানে চলে গেল। সিলেটের পার্শ্ববর্তী জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাছারে তখন মুসলমান গুন্ডাদের বলতে শোনা যেত 'সিলেট নিলাম গণভোটে, কাছার নিমু লাঠির চোটে।' বলা যায় এবারের লোকসভায়, এরকম একটি মহড়া হয়ে গেল। এই মহড়া সফল হয়ে গেলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

> পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভোটকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ও ভোট পড়ার উচ্চহার যে এরাজ্যে বড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী এবিষেয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম দুই পর্বের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভাবে জনজাগরণের কাজ ও ভোটকর্মী হিসেবে যুক্ত থাকার সুবাদে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে যে এই নির্বাচন উপলক্ষে উদ্ভুদ্ধ পরিস্থিতি শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয় সমস্ত দেশের জন্যই এক অশনিসংকেত। এবার ভোটের দামামা বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা আসনগুলির প্রচারপর্বে যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হলো কিছু ব্যতিক্রম বাদে হিন্দু জনবসতিগুলি সেজে উঠে ছিল বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুনে, আর মুসলমান মহল্লাগুলি তৃণমূলের। নমাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে হোক কিংবা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারে হোক মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিজেপিকে একটি ভোট নয়, কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিজেপিকে ভোট দিতে পারে না— এক শ্রেণীর মুসলমান সর্বশক্তি দিয়ে এই ধরনের প্রচার চালিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে হিন্দু ভোটারদের শাসানো হয়েছে তারা যেন ভোটকেন্দ্রে না যায়। শাসানি অগ্রাহ্য করে যে সমস্ত এলাকায় হিন্দুরা ভোট দিতে গেছে সেখানে বোমা

পড়েছে গুলি চলেছে। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে এরকম দু'চারটে ঘটনা সর্বসমক্ষে এসেছে। যেমন প্রথম দফায় কোচবিহার লোকসভার শীতলখুচি, দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় অনেক বুথে হিন্দুরা ভোট দিতে যেতে সাহস পায়নি। একদিকে নির্বাচন কমিশন বুথ রক্ষা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে মুসলমান দুষ্কৃতীরা এলাকা দখল করতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মানুষ অনেক আশা করেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে, প্রত্যেকটি এলাকায় রুট মার্চ করে মানুষের আস্থা ফেরাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল রুট মার্চ তো দূরের কথা ভোটের দিন প্রত্যেকটি বুথেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হলো না। তবে যেখানেই সুযোগ পেয়েছে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে সেখানেই ভোট দিয়েছে।

সমগ্র ভারতেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনী হিংসা, বুথদখল, ছাপ্পাভোট ও অনিয়মের অভিযোগে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রমী রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় অবাধ এবং নিরিবচ্ছিন্ন ছাপ্পা প্রদানের জন্য তৃণমূলি লুম্পেন ও বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা উর্দিপরা পুলিশের যৌথবাহিনী এমন তাণ্ডব চালিয়েছে যে সাধারণ মানুষ বুথে মুখো হতে পারেনি। স্থানীয়রা প্রতিরোধ গড়ে কোথাও ভোট করালেও গণনা কেন্দ্রে ছাপ্পা চালিয়ে ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়েছে। যারাই এই অনাচারের প্রতিবাদ করেছে তাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো থেকে শুরু করে নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। ছাপ্পার প্রতিবাদ করায় রাজকুমার রায় নামে এক প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ফলে এবার লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে উত্তাল হয়েছে সমস্ত রাজ্যের ভোটকর্মীরা। লোকসভা নির্বাচনে ভোটকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক অধ্যাপক সরকারি কর্মচারীরা বুথের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। আওয়াজ উঠেছে কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার— চাই না হতে রাজকুমার, উই ওয়ান্ট সেন্ট্রাল ফোর্স। অনেক জায়গায় ভোটকর্মীরা অবস্থান আন্দোলন, পথঅবরোধ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মতো আন্দোলনেও শামিল হয়েছে। প্রতিবাদের ভাষায় ফুটে উঠেছিল রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য পুলিশের উপর তীব্র অনাস্থার ছাপ।

গত ১৮ এপ্রিল দ্বিতীয় দফা ভোটে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বুথে রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট নয় বলে গ্রামবাসীরা ভোট কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বুথে প্রবেশ করতে দেয়নি। অবশেষে গ্রামবাসীদের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের করিয়েই ভোট করাতে হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় দার্জিলিং লোকসভার চোপড়ার কোটগাছ, দিঘি কলোনি বুথ এলাকায় বোমাবাজি, শূন্যে গুলিচালনা, ভোট দিতে ব্যার্থ ভোটারদের পথ অবরোধের ঘটনা, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের ইসলামপুর বিধানসভার কয়েকটি বুথে ভোটারদের ভোট দানে বাধাদানকে ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনার দৃশ্য মানুষ দেখেছে। রায়গঞ্জ কেন্দ্রের ইসলামপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি বুথেই এদিন অবাধ ছাপ্পা চালিয়েছে শাসক তৃণমূলের গুন্ডারা। অনেকের মতে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় রিগিং ছাপ্পার দৃশ্য যতটা ধরা পড়েছে বা প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিবেদনে যতটা রিপোর্টিং হয়েছে সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ১১ এপ্রিল প্রথম দফাতেও কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের শীতলখুচি, সিতাই ও দিনহাটা বিধানসভা সভায় অনেক বুথেই রিগিং ছাপ্পার ঘটনা ঘটেছে। প্রথমদফায় ভোটকর্মীদের আলাপচারিতায় রিগিং ছাপ্পার যত ঘটনা শোনা গেছে সংবাদমাধ্যমে তার সিকি ভাগও আসেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এরাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের এতটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও লোকসভা নির্বাচনে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো কেন? কেনই বা বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বললেন কোনো রাজ্যের প্রতিটি বুথ সেন্সেটিভ হতে পারে না। বুথ সেন্সেটিভিটি নিয়ে এমন তালিকা করা তৈরি হলো যে প্রথম দফায় ষাট শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর চল্লিশ শতাংশ বুথে রাজ্য পুলিশ। প্রথম দু' দফা ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বলছে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত বুথে বেশি গোলমাল হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী যে গুলিতেই রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যে সমস্ত বুথে রাজ্য পুলিশ মোতয়েন ছিল সেগুলির অধিকাংশতেই করানো হয়েছে ছাপ্পা ভোট অথবা ইভিএমের সামনে দাঁড়িয়ে ভোট করানোর ঘটনা। যে সমস্ত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস দুর্বল সেই সমস্ত বুথে নিযুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয়বাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পর্যায়েই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে এই তালিকা রাজ্য প্রশাসনের মদতে তৃণমূল কংগ্রেসের রিগিং মেশিনারীর তত্ত্বাবধানেই তৈরি হয়েছে। প্রথম দফায় নির্বাচনের একদিন আগে জেলা পুলিশ সুপারকে সরানো হয়েছে ঠিকই তবে ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট তালিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে এমনটা কারো মনে হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ডিএম এসপিদের এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের খোঁজ পেলেন না, নাকি সর্ষেতেই ভূত। এই সমস্ত বিষয়ই বিশদ তদন্তের দাবি রাখে। তবে একটি মত কিন্তু উঠে আসছে তা হলো এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া মমতা নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতায় রেখে কোনো ভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

২০১৪ সালের তুলনায় সমস্ত ভারতেই ভোট পড়ার হার কম। কিন্তু ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। তৃতীয় দফায় সারাদেশে গড়ে ৬৪.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই জাতীয় গড়কে ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়ছে ৭৮.৯৮ শতাংশ। অতীতেও দেখা গেছে ভোটপড়ার উচ্চহার সাধারণত বড়ো ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করে। যেমন ২০১৪ সাএলর লোকসভায় ভোট পড়ার উচ্চহার বড়ো পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিল। সব মিলে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভোটকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ও ভোট পড়ার উচ্চহার যে এরাজ্যে বড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী এবিষেয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ■

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অজ্ঞানতায় ইত্যাকার অশিষ্টাচারের জন্ম

শেখর সেনগুপ্ত

গণতন্ত্রের বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত আলোচনায় ব্রতী হলে আমাদের অন্তরে দুটি ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাই। বিষয় দুটো নতুন কিছু নয়; কিন্তু এদের সার্থক প্রয়োগ যে-যে দেশে আমরা দেখতে পাই, তাদের ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। প্রথমটি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, দ্বিতীয়টি নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারবোধ সেখানেই প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষই রাজনীতিতে যোগ দিতে বাধামুক্ত এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীর কনস্পিরেসি হালে পানি পায় না। ইতিহাস চর্চা করলে আমরা দেখতে পাব, বহু শত বছর পূর্বেও মানুষের মনে গণতন্ত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র, যদিও শিরোনামে পৌঁছে থাকার মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। ইতিউতি গণতান্ত্রিক কাঠামো নজরে এলেও, তাতে পুলকিত হবার যোগ্য আবহ মানুষ পায়নি। যিশুর জন্মের ৫১৫ বছর আগের গ্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সে গণতন্ত্রের আংশিক প্রয়োগ ঘটেছিল। আংশিক শব্দটি ব্যবহার করলাম এই কারণে যে, তখন এথেন্সে মহিলা ও ক্রীতদাসদের কোনও ভোটাধিকার ছিল না। কালান্তরে গ্রিসের অন্যান্য দেশেও গণতন্ত্রের কিছু কিছু আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। যুগের প্রেক্ষিতে ওই যে উন্নত আয়োজন, তার পিছনে রয়েছে গ্রিক দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞদের ধারাবাহিক চর্চা ও অভিমত। যেমন প্রাচীন গ্রিসের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পেরিক্লিস বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র সর্বত্র স্বাগত। কারণ, গণতন্ত্রেই মৌলিক সৃজনশীলতা যথাযথ সম্মান পায়। এই ব্যবস্থা মানবিকতারও রক্ষাকবচ। তাই গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধতার সঙ্গে লালন করা উচিত।' কিন্তু গ্রিসের অন্য দুই বরেণ্য দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল অত দরাজভাবে গণতন্ত্রের আইকনিজকে সমর্থন জানাননি। তাঁরা বললেন, রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে লালন করা দুষ্কর। নীতিকথা অনেক সময় নির্মম কল্পকথা হয়ে দাঁড়ায়। যা ছিল উজ্জ্বল, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মসিলিপ্ত। কারণ নাগরিকরা একই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নেই। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল যে কারণে গণতন্ত্রকে সার্টিফিকেট দিতে ব্যগ্র হননি, বহুযুগ পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল তার ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে : 'গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে দুইটি শর্ত পূরণের ওপর। প্রথমত, এমন আর্থিক সাম্য যেন সংশ্লিষ্ট দেশটিতে থাকে, যার প্রভাবে অর্থের বিনিময়ে একজন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির অভিমতকে স্বপথে টেনে আনতে অসমর্থ হন। দ্বিতীয়টি হলো শিক্ষা। যে দেশে অধিকাংশ নাগরিক শিক্ষিত নন, গণতন্ত্র সেখানে একটি সোনার পাথরবাটি মাত্র।'

স্টুয়ার্ট মিলের এই উপলব্ধির সত্যতা অনস্বীকার্য হওয়ায় আমাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ বিমর্ষ হতেই পারেন। নির্বাচনী প্রচারে নেমে রাহুল গান্ধী যখন 'ন্যায়' শীর্ষক ধ্বনিকে উচ্চকিত করে তোলেন স্রেফ ভোট কেনার তাগিদে, আমরা একটু চিন্তা করলেই স্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যাকে টেনে আনতে সমর্থ হব। স্রেফ ভোট কেনার জন্য এই যে মেধাশূন্য আকুলি-বিকুলি, ইদানীং আমাদের দেশে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অজ্ঞানেই ইত্যাকার অশিষ্টাচারের জন্ম। ইতালির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেকিয়াভেলি সেই মধ্যযুগেই বলে গেছেন, 'যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতির আখড়া, জনসাধারণের নৈতিক কর্তব্য হলো সেই আখড়াকে পদদলিত করা। এর জন্যই প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক দেশে একটি মজবুত সংবিধানকে কার্যকর করা।'

মেকিয়াভেলির এই শেষোক্তে মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, সংবিধানই হলো একটি গণতান্ত্রিক দেশের সর্বাপেক্ষা পবিত্র দেবপ্রতিম আয়ুধ। এই আয়ুধকে অতীতে যিনি বা যাঁরা মান্যতা দেননি, বর্তমানেও যাঁরা একে নানাভাবে অপব্যবহার করতে চান, জনতার সমবেত ধিক্কারে তাঁরা যেন নিক্ষিপ্ত হন আবর্জনার স্তূপে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান। প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সবিস্তার বর্ণাঢ্যতায় টানা সরলরেখায় এই মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সর্বজন বরেণ্য ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ওই অজটিল গ্রন্থনাকেই জটিল ও কলুষিত করবার মতো দুর্বৃত্তরা জুটে যান, যদিও তাঁদের সরাসরি চিহ্নিত করবার প্রয়াস আজও লক্ষণীয় নয়। বিষয়টা সামান্য খুলে বলতে চাই। ওই মহাগ্রন্থ লেখা হয়েছিল কালি ও কলম দিয়ে। এবং গ্রন্থটির চিত্রায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল কালজয়ী প্রতিভাদীপ্ত চিত্রকর নন্দলাল বসুর ওপর। নন্দলাল বসু সেই হস্তলিখিত গ্রন্থটিতে সংযোজিত করেন অনেকগুলি অসাধারণ ছবি। ছবিগুলির বিষয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের একাধিক ঘটনা; ছিল গৌতমবুদ্ধ সমেত প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় ভারতের গর্ব বেশ কয়েকজন সাধু-সন্তের অবয়ব। আজ ভাবতে ঘৃণা বোধ হয় যে, সংবিধান মুদ্রণকালে দেখা গেল ওই অমূল্য চিত্রগুলিকে কে বা কারা বিনষ্ট করে ফেলেছেন। একটি ছবিও খুঁজে পাওয়া গেল না। বলাবাহুল্য, ক্ষমতার তখতে তখন আসীন জওহরলাল নেহরু— যিনি ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চুপ। সামান্যতম দুঃখপ্রকাশেও কুঁড়েমি।

এর পরবর্তীকালে আরও এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে কথা বলতে গেলেই সমকালীন সরকার হয় আয়েশি নতুবা হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমাদের আদি সংবিধানের প্রস্তাবনায় Socialist এবং Secular এই শব্দ দু'টি ছিল না। সংবিধান প্রথম মুদ্রিত হবার ২৭ বছর বাদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওই দুই শব্দকে নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু কোনও তারিখ বা স্বাক্ষর বা ব্যাখ্যা রাখেননি। পাঠ করলে মনে হবে স্বয়ং আম্বেদকরই বুঝি 'প্রস্তাবনা'য় শব্দদুটিকে স্থান দিয়ে গিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে এক ধরনের লুকোচুরি। পরবর্তী প্রজন্ম যাতে অন্যান্য শপথের সঙ্গে ওই সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকেও সম গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়, তার একটা বন্দোবস্ত করে গেলেন শ্রীমতী গান্ধী। কে আর অত অতীত ইতিহাস ঘেঁটে এই সমস্ত লুকোচুরির হদিশ খুঁজতে বের হবে? সেই থেকে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের পরও এই খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অত বোলচাল ও তরিবত উপচে পড়া আবেগ। ভারতের ইতিহাসের অনেক পর্বই এভাবে অবিরত শয়নে নিশ্চল। আড়মোড়া ভাঙবার দায়িত্ব নিতে হবে এই প্রজন্মকেই। ■

'অ্যাডভান্টেজ বিজেপি'

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বইছে গেরুয়া ঝড়

সনাতন রায়

আজ যখন গোটা ভারতবর্ষে লোকসভার ভোটপর্ব মধ্য গগনে, তখন চতুর্দিকে তাকালে মনে হচ্ছে গেরুয়া আঁধির এক অত্যাশ্চর্য মায়াবী আলোয় ভাসছে ভারতবর্ষ। সে আলো ২০১৪-র চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি উচ্ছল। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং, বোধহয় বলাই ভালো— পশ্চিমবঙ্গে এবারের গ্রীষ্মে কালবোশেখি নয়, চলছে গেরুয়া ঝড়। কোচবিহার থেকে ডায়মন্ডহারবার। আর সেই গেরুয়া ঝড়ে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত বাকি সব রঙ—সবুজ, লাল কিংবা তেরঙা। এবং সর্বত্র বিশেষ করে যেখানে সশরীরে হাজির এযাবৎকালের ব্যতিক্রমী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। প্রত্যেক জনসভায় এই চড়া গ্রীষ্মেও জনপ্লাবন খোলা মাঠে। না, এখন আর মানুষ হেলিকপ্টার দেখতে ভিড় জমায় না। তাই হেলিকপ্টার নামিয়েও খালি ফাঁকা ময়দান থেকে ফিরে যেতে হয় তৃণমূল প্রার্থী তথা তারকা দেবকে। আর রাণাঘাটে, জগদ্দলে, শিলিগুড়িতে কোচবিহারে বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে ভিড় জমান লক্ষ লক্ষ মানুষ। না এজন্য কোনও গোয়েবলসকে দরকার হয় না। জনতার চোখ আর গণমাধ্যমের ক্যামেরার চোখই চিনিয়ে দেয়, চ্যালেঞ্জমুখী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় একই অঞ্চলের সভায় ভিড় কতটা আর জনতার হাততালি ও সমবেত কণ্ঠের স্লোগান কার সভাকে উজ্জ্বল করে তোলে বেশি— মমতার নাকি মোদীর! পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এ এক নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। একদিকে যখন ভোটের দিনগুলিতে শাসকদলের আস্ফালনের তিরে বিদ্ধ হচ্ছে সাধারণ ভোটাররা, তখন বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে জনগণ কোনও নেতৃত্ব ছাড়াই প্রতিবাদে আছড়ে পড়ছে সর্বত্র। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের প্রশাসনেও সরকার-বিমুখ জনগণ এভাবে ভোটের দিন সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরোধিতায় পথে নামেনি। সাহস করেনি শাসক দলের সামনে লাঠি তুলে বলতে— এক পা এগোও, তোমায় বুঝিয়ে দেব বাংলার মাটি সত্যিই মা মাটি মানুষের। শুধু তোমাদের দিদির স্লোগানের নয়। এবার মরা গাঙ্গে বান এসেছে। হাল ধরেছেন মোদী। গেরুয়া ঝড়ে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ এবার নতুন ইতিহাস রচনার পথে। শাসকদল মানেই গায়ের জোর। সেই গায়ের জোরেই ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে বিজেপির পতাকা, হোর্ডিং। জায়গায় জায়গায় প্রার্থীদেরও আক্রমণ করা হচ্ছে। মুছে দেওয়া হচ্ছে দেওয়াল লিখন। কিন্তু জনতা এবার যেন ফিনিক্স পাখি হয়ে উঠেছে রাতারাতি। ধ্বংসের আবহাওয়া পুনর্জন্ম নিয়ে জেগে উঠছে জনতা। দিগ্‌বিদিক মাতাল করে আওয়াজ উঠছে— ভারতমাতা কী জয়, মোদীজী জিন্দাবাদ।

অর্থাৎ এক এক দফার ভোট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে স্পষ্টতই ছড়িয়ে পড়ছে একটি দুরন্ত বার্তা— 'অ্যাডভানটেজ বিজেপি।' অর্থাৎ সপ্তদশ নির্বাচনের হাওয়া পুরোপুরি বিজেপি অনুকূলে জোরদার হচ্ছে প্রতিদিন। সমীক্ষক সংস্থাগুলি গত দু' মাসেরও বেশি সময় ধরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবার ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে যেসব সমীক্ষাগুলি জনগণের দরবারে পেশ করেছেন, তাতেও দেখা গেছে বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক ফলাফলের গ্রাফ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এখন তো সমীক্ষকরা বলতে শুরু করেছেন— বিজেপি একক ভাবে শুধু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই পাবে না, এবার আসনসংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যাবে যা এযাবৎকালে গেরুয়া রাজনীতিতে নজিরবিহীন।

হিসেবের গভীরে পৌঁছনোর আগে মাথায় রাখতে হবে, ২০১৪ সালে এ রাজ্যে চলছিল তৃণমূল কংগ্রেসের হাওয়া নয়, সাইক্লোন। সেই পরিস্থিতিতেও কিন্তু বিজেপি রাজ্যের ২১টি আসনে গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই কেন্দ্রগুলি ছিল : দার্জিলিং, আসানসোল, আলিপুরদুয়ার, কৃষ্ণনগর, কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, বারাসাত, দমদম, শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, হাওড়া, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, মালদা দক্ষিণ, বনগাঁ, বীরভূম, বসিরহাট, রায়গঞ্জ, বর্ধমান, দুর্গাপুর, রানাঘাট ও জলপাইগুড়ি। দার্জিলিংঙে ৪৩.৪ শতাংশ আর আসানসোলে ৩৭.১ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিল বিজেপি। উল্লেখযোগ্য ফল হয়েছিল আলিপুরদুয়ারে (২৭.৯ শতাংশ), কৃষ্ণনগরে (২৬.২ শতাংশ), কলকাতা উত্তরে (২৬.১ শতাংশ), কলকাতা দক্ষিণ (২৫.৭ শতাংশ), বারাসাতে (২৩.৬ শতাংশ)। ভোট হয়েছিল মূলত রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে। ভোট লুট হয়েছিল অবাধে। এমনকী বিধাননগরের মতো অতি সচেতন অঞ্চলেও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মারধোর করা হয়েছিল।

এবার রাজ্য পুলিশ কম। আধা সেনা বেশি। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায়, অন্যান্য সব আসনের মতোই এই আসনগুলিতে বিজেপির ভোট বাড়বে বেশ কয়েক শতাংশ। কারণ রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী তথা শাসকদল বিরোধী ঝড়ের প্রাবল্য প্রমাণ করে দেয় রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত জনতার ড্রোন-ফটোগ্রাফ।

শুনলে অবাক লাগলেও এবার ভোটের 'অ্যাডভানটেজ বিজেপি'র অন্যতম ফ্যাক্টর হলো সংখ্যালঘু ভোট। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে হিন্দু ভোটের সংখ্যা মোট ভোটারের ৭১.৩৫

হলো ২৭.৩৫ শতাংশ। অন্যান্য ভোট রয়েছে ১.৩০ শতাংশ। ৩০ শতাংশের বেশি মুসলমান ভোট রয়েছে এমন লোকসভা কেন্দ্র এ রাজ্যে মোট ১৩টি। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলমান ভোটার বহরমপুরে ৬৪ শতাংশ, জঙ্গীপুরে ৬০ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৫৯ শতাংশ, রায়গঞ্জে ৫৬ শতাংশ, বসিরহাটে ৪৪ শতাংশ, মালদা উত্তরে ৫০ শতাংশ, মালদা দক্ষিণে ৫৩.৪৬ শতাংশ। এছাড়া বীরভূম, যাদবপুর, মথুরাপুর, কৃষ্ণনগর, ডায়মন্ডহারবার এবং জয়নগর কেন্দ্রে ৩০ থেকে ৩৬ শতাংশ মুসলমান ভোটার রয়েছে। এতদিন বেশি মুসলমান ভোট পেত কংগ্রেস ও তৃণমূল। তারপর বামদলগুলি। এবার এইসব বিরোধী দলগুলিই এককভাবে লড়ছে। অর্থাৎ মুসলমান ভোট তিন ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানরা এখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। সেই আশঙ্কা থেকেই একাংশ সরাসরি ভোট দেবে বিজেপিকে। তার ওপর আছে ত্বহা সিদ্দিকির মতো ইমামদের চোখ খুলে দেওয়া বক্তৃতা যে মমতা সরকার মুসলমানদের জন্য কোনো উন্নয়নই করেনি। তার প্রভাব পড়বে।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে ১৯টি কেন্দ্রে জয় পরাজয় নির্ধারণ হয়েছিল মাত্র ১০ থেকে ১১ শতাংশ ভোটের মার্জিনে। এবারে কি হবে? ২০১৪ সালে বামেদের ভোট শতাংশ ছিল ২০-র নীচে। কংগ্রেস মুসলমান ভোট নিয়েও পেয়েছিল মোট ৬ শতাংশ ভোট। এবার ভোটে বামেদের ভোট আরও কমবে এবং তা পড়বে তৃণমূল বিরোধী ভোট হিসেবে বিজেপির

ভোট ৬ শতাংশ রয়ে গেল, তাহলেও একথা জোর গলায় বলা যায় ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটারের একটা বড়ো অংশ যারা তৃণমূলের সমর্থক হিসেবেই পরিচিত ছিল এবার তারা শিবির বদল করবেই। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর মুসলমান তোষণের রাজনীতি। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো? হিন্দুরা তাই এবারে সমস্বরে আওয়াজ তুলেছেন— মোদীকে চাই। কারণ মোদীই হতে পারেন হিন্দুদের রক্ষাকর্তা। যতই মেকি বিপ্লবী আর বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়ে মোদী বিরোধী স্লোগান তুলুন না কেন, এবার হিন্দুভোট অনেক বেশি ইতিবাচক হারেই বিজেপিকে সমর্থন জোগাবে। ২০১৪-য় ১৯টি আসনে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল ১০ থেকে ১১ শতাংশ ভোটের মার্জিনে। এই আসনগুলিতে তৃণমূল যদি ১০ শতাংশ ভোট কম পায় তাহলে ১৭টি আসনে তৃণমূলের হার নিশ্চিত। সেই সঙ্গে রয়েছে ১১টি আসন যেখানে বিজেপি ১০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল— হুগলি (১৬.৬ শতাংশ), কোচবিহার (১৬.৫ শতাংশ), ডায়মন্ডহারবার (১৬.১ শতাংশ), মালদা উত্তর (১৫.৫ শতাংশ), বোলপুর (১৫.৩ শতাংশ), মেদিনীপুর (১৪.৫ শতাংশ), বিষ্ণুপুর (১৪.৪ শতাংশ), বর্ধমান পূর্ব (১৩.১ শতাংশ), যাদবপুর (১২.৪ শতাংশ), আরামবাগ (১১.৮ শতাংশ), উলুবেড়িয়া (১১.৬ শতাংশ)। এর প্রতিটি আসনেই বিজেপির ভোট বাড়বে।

মতো আসনে বিজেপির জয় প্রায় নিশ্চিতই। বিজেপির ভোট বাড়া মানেই তৃণমূলের ভোট কমা। তাছাড়া রাজ্য জুড়ে চতুর্মুখী লড়াইয়ে ক্ষতি বেশি হবে তৃণমূলেরই। কারণ বামপন্থী দলগুলি এবং কংগ্রেস থেকে ছিটকে আসা সব ভোটই এবার পড়বে বিজেপিতে। তৃণমূল থাকবে ব্রাত্য। কারণ— ১। মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচার, ২। মুখ্যমন্ত্রীর অগণতান্ত্রিক কেন্দ্র বিরোধিতা, ৩। কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে রাজ্যের প্রকল্প বলে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া, ৪। জনগণের অর্থ ব্যক্তিগত তহবিলের মতো ক্লাব, পুজো, ইমাম ভাতা, বিষ মদে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া। ৫। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারে বিদেশি নাগরিকের বসবাস, ৬। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ও ভাইপোদের দুর্নীতি ও আর্থিক রমরমা, ৭। ভঙ্গুর দলীয় সংগঠন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, ৮। সারদা ও নারদা কাণ্ডে শীর্ষস্থানীয় তৃণমূল নেতা ও সরকারি আমলাদের যোগাযোগ, ৯। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ, ১০। তৃণমূল ক্যাডারবাহিনীর অত্যাচার। এর সঙ্গে অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে থাকছে— বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি, সহনশীল ও বাস্তবমুখী নেতৃত্ব এবং রাজ্যের মানুষের জাগ্রত বোধশক্তি যে অকারণে কেন্দ্র বিরোধিতা মানে নিজের রাজ্যের ক্ষতিসাধন করা। তাই রাজ্যের শাসকদল রাজ্যকে যত বেশি বিরোধীমুক্ত করতে চাইবে, ততবেশি শক্তিশালী হবে বিজেপি জনসমর্থনের জোয়ারে। তার প্রমাণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত বিজেপি তথা মোদীজীর পক্ষে প্রচারের ঢল। 'উলঙ্গ রাজা'র রাজনীতির ধরাচুড়া ছিঁড়ে ফেলছে মানুষ প্রতিদিন। এখন দরকার শুধু হিন্দু সচেতনতা, কারণ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন সিদ্ধান্ত নেবে ২০২১-এর পর পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘুদের রাজ্য হয়ে উঠবে কিনা। নাকি বিশ্ববাংলা লোগোর কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গ অনেক বড়ো চক্রান্তের শিকার হয়ে বাংলাদেশের একাংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে নয়া দেশ গড়ে উঠবে কিনা। আর সেই দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সখ মেটাবেন কিনা। হিন্দু সচেতনতা, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সঠিক ভোট ভাবনাই ঠিক করে দেবে— এবারের ফলাফল। গেরুয়া ঝড়কে আরও প্রবল করে তুলতে হবে। সাইক্লোন নয়। এ রাজ্যে গেরুয়া ঝড় হয়ে উঠুক টর্নেডো। একটা নতুন ইতিহাস রচিত হোক পশ্চিমবঙ্গে। নয়া উন্নয়ন, নয়া প্রশাসন, নয়া বিচারধারার ইতিহাস।

উপচে পড়ছে জনসভা, রাজ্যে এবার মোদী-ঝড়

অভিমন্যু গুহ

দোসরা মে, ভাটপাড়া ময়দানে নির্বাচনী প্রচারে এসে আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ মাঠ ভরেনি সেভাবে। দুই 'গদ্দার'কে ভোট মিটলে তিনি 'দেখে নেওয়ার' হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বসলেন। এই 'গদ্দার'দের সবাই চেনে, এরা বলাই বাহুল্য মুকুল রায় ও অর্জুন সিংহ। প্রায়শই মমতার থেকে এধরনের হুমকি রাজ্যবাসী এবং তাঁর পুরনো দলীয় সহকর্মীরা শুনে থাকেন। তবে সেদিন যে তাঁর কণ্ঠে বাড়তি উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের তা নিশ্চয়ই নজর এড়ায়নি। আসলে ২৯ এপ্রিল এই মাঠেই জনসভা করে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সভায় প্রবল গরম উপেক্ষা করে এমন ভিড় হয়েছিল যে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

এবারের ভোটে মমতা একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন, যে স্ট্র্যাটেজি তিনি বিগত বেশ কিছুদিনই অনুসরণ করছেন, সেটি হলো মোদী বা অমিত শাহ বাঙ্গলায় যেখানেই সভা করুন না কেন তার পালটা কর্মসূচি সেখানে মমতা বা তাঁর ভক্তেরা নেন। উদ্দেশ্য ধমক চমক দিয়ে এলাকাবাসীকে সন্ত্রস্ত করে রাখা, যাতে মোদী প্রভাব তাঁদের ওপর না পড়ে। এই স্ট্র্যাটেজি এবার গোড়া থেকেই বেসুরো বাজছে। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে যেমন। মোদীর সভায় তিল ধারণের জায়গা না থাকলেও, মমতার জনসভা বেশ ফাঁকা ফাঁকা দেখিয়েছে। তার মানে ধমক-চমক আর সেভাবে কাজ করছে না। তার মানেই তো মোদী জাদু শুরু হয়ে গিয়েছে ঠিক গতবারের মতো। এর মানে আবার মোদী ঝড়ের পূর্বাভাস।

মোদীর ঝড় যে উঠবে তা টের পাওয়া গিয়েছিল গত ৩ এপ্রিলই, শিলিগুড়ি আর কলকাতার ব্রিগেডে তাঁর জোড়া সভার মধ্যে দিয়ে। ১৯ জানুয়ারি 'দুনিয়ার ধান্দাবাজ এক হও' স্লোগান দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদী বিরোধী রাজনীতিকদের ব্রিগেডে একজোট করে নিজের 'ক্ষমতা' দেখিয়েছিলেন। বিজেপি এরপর নরেন্দ্র মোদীকে এনে ব্রিগেডে সভা করার আয়োজন করতে যায়। কিন্তু স্বল্প সময়, তার আগে রথ নিয়ে জটিলতা ইত্যাদি কারণে ব্রিগেডে সেই সভার আয়োজন করা যায়নি। মমতার ধামাধরা সংবাদমাধ্যম রটিয়ে দেয় ব্রিগেডে মোদীর সভায় লোক জড়ো করা যাবে না বুঝেই নাকি কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওখানে সভা আয়োজনে নিষেধ করে। যদিও আদর্শ নির্বাচন বিধি বলবৎ হওয়ার দৌলতে মমতার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কমতেই একই দিনে অর্থাৎ ৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি ও ব্রিগেডে মোদীর জোড়া সভা আয়োজনের সুযোগ পায় বিজেপি।

ব্রিগেডের সভায় লাগানো হয়েছিল বড়ো বড়ো পাঁচটি 'হ্যাঙার', মূলত রোদের হাত থেকে কর্মী-সমর্থকদের বাঁচাতেই। সোশ্যাল মিডিয়া, আর মিডিয়া দু' জায়গাতেই রসিকতার বান ডাকল, কেউ বলল সভায় লোক হবে না তা আড়াল করতেই হ্যাঙার লাগানো হয়েছে। আবার কারোর বক্তব্য, মূলত সমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে, কালোটাকা খরচ করে টাঙানো হয়েছে হ্যাঙার। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মোদীর ব্রিগেড ও শিলিগুড়ি— একইদিনে দু'দুটো জনসভায় ভিড় উপচে পড়েছিল। ব্রিগেডে জনগণের মাথায় রোদ না লাগার ব্যবস্থা থাকলেও, ভিড়ের চাপে ওই সামান্য পাঁচটা হ্যাঙারে কোনও কাজ হয়নি। হ্যাঙার উপচে ভিড় ব্রিগেড ভরিয়ে দিয়েছিল।

মোদীর নেতৃত্বে গেরুয়া ঝড় উঠেছিল ঠিক পাঁচ বছর আগে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময়। পাঁচটা বছর পেরিয়েও ঝড়ের প্রাবল্য কোনও অংশে কমছে না। এ রাজ্যে তো বটেই। এখান মোদী ঝড়, ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সৌজন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিরোধীরা। একদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ যেমন তৃণমূলের সন্ত্রাস দেখেছে, অন্যদিকে যাদবপুরে মাওবাদী মার্কসবাদী তাণ্ডব, খাড়্‌ড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড, রাজ্যজুড়ে মৌলবাদী তাণ্ডব, হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা, কংগ্রেসের দেশদ্রোহিতা— গত পাঁচ বছরে মোদী-বিরোধিতার চরিত্র বাঙ্গলা হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে। তাই ব্রিগেডে মোদীজী তাঁর প্রথম জনসভাতেই বলে দিয়েছিলেন— মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে বিরোধীরা বিষয়টি দেশ বিরোধিতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বাঙ্গলার মানুষকে দেশভক্তি ভুলিয়ে দিতে, ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করতে বামপন্থী-তৃণমূলি বুদ্ধিজীবীরা যতই সচেষ্ট হন না কেন, মোদী ঝড়ের তীব্রতা যেন তাতে আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থ দফার নির্বাচন অবধি মোদী সারা দেশে ৮৭টি নির্বাচনী জনসভা করেছেন, তিনটি বড়ো রোড শোও করেছেন একমাসের সামান্য বেশি সময় ধরে। তাঁর নির্বাচনী জনসভার অধিকাংশটাই মূলত পাঁচটি রাজ্যকে কেন্দ্র করে, রাজ্যগুলি হলো উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও গুজরাট। এর মধ্যে বাঙ্গলা ও ওড়িশা বাদে বাকি তিনটি রাজ্যেই বিজেপি সরকার এবং এই রাজ্যগুলি থেকে এবারের লোকসভাতেও বিজেপি খুব ভালো ফলেরই আশা করছে, অন্তত মায়া-অখিলেশের ধান্দাসর্বস্ব জোট এক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধক হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বাকি থাকল ওড়িশা ও বাঙ্গলা। ওড়িশায় বিজেপির সাংগঠনিক ভিত্তি খুব ভালো, তার ওপর নবীন পট্টনায়কের রাজনৈতিক অবস্থা এই মুহূর্তে মোটেও সুবিধের নয়। ফলে এই রাজ্যেও এবার ভালো ফল করছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় নির্বাচন। চতুর্থ দফা অবধি মোদীজী যেভাবে ঘন ঘন প্রচারে এসে মাত করেছেন, তাতে মমতা আর মমতাপন্থী মিডিয়া অস্বস্তি বোধ করেছে, রসিকতার ঢঙে বলা হচ্ছে 'মোদী ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন।' খোদ মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ দফার শেষে মোদীর প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন : 'অন্ধ্রপ্রদেশ আসন পাবে না, ওড়িশায় আসন পাবে না, পঞ্জাবে পাবে না, রাজস্থানে আসন কমবে, উত্তরপ্রদেশে আসন কমবে, গুজরাটে আসন কমবে। আগে এগুলো সামলাও, তারপর বাঙ্গলার দিকে তাকাতে আসবে।' মমতার কথাতেই স্পষ্ট যে মোদীর জনসভা তাঁকে ভীত, সন্ত্রস্ত করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল যে রাজ্যের প্রকৃত নির্বাচনী ছবি নয়, তা একটা বাচ্চাও বোঝে। তাই মমতা খুব ভালোভাবেই জানেন ২০১৯-এ 'মোদী ফিনিশ' স্লোগানকে বাস্তবায়িত না করতে পারলে, ২০২১-এ তিনি নিজেই 'ফিনিশ' হয়ে যাবেন। তাই মোদীর জনসভায় ভিড় তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটালে আশ্চর্যের কিছু নেই।

শিলিগুড়ি, কলকাতার ব্রিগেড, ব্যারাকপুর ছাড়াও বোলপুরের ইলামবাজার, শ্রীরামপুর, ঠাকুরনগর, মোদীর একের পর এক জনসভায় ভিড়ের বহর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎকণ্ঠিত করেছে, এতটাই যে ১ মে হাওড়ায় একটি জনসভায় তিনি অভিযোগই করে বসেন যে বিজেপি নাকি এক একটি জনসভার পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এজেন্সি ভাড়া করে ফ্ল্যাগ-ব্যানার দিয়ে লোক পাঠিয়ে মাঠ ভরছে। এরপরই তিনি অভিযোগ করেন এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে। সেদিন তৃণমূলের যে কর্মী সমর্থকরা ময়দান ভরিয়েছিলেন নেত্রীর এই কথা শুনে হাসি চাপতে পারেননি তাঁরাও। কারণ সবারই মনে আছে মমতা প্রশাসনের বিজেপির রথযাত্রা রোখার কী ঐকান্তিক উদ্যম। সেই গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা কেবলমাত্র বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। দীর্ঘদিন এরাজ্যে হিন্দুদের অবদমিত করে রাখার প্রতিবাদও ওই সেই কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ ছিল। 'সাম্প্রদায়িক হিংসা' রোখার অজুহাতে বিজেপির যাত্রা কর্মসূচি বাতিল, যার জন্য মোদী-অমিত শাহকে এরাজ্যে আসতে না দেওয়া রাজ্যের সাধারণ হিন্দুদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। যার প্রতিফলন একদিকে যেমন এরাজ্যে মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথদের সভায় উপচে পড়া ভিড়ে পড়ছে, অন্যদিকে মমতা আর তাঁর শাকরেদদের সভা শুরু হচ্ছে ফাঁকা মাঠে। মমতা নিজে পর্যন্ত শিলিগুড়িতে কার্যত ফাঁকা জায়গায় তাঁর সভা শুরু করতে বাধ্য হন। বিজেপির সভায় যাঁরা মাঠ দিতেন (যেখানে সভার জন্য সরকারি মাঠ পাওয়া যেত না), কিংবা বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যে কর্ম-সমর্থকদের বাড়ি সহভোজনে যেতেন তাঁদের ভিটেতে ঘুঘু চরানোর বন্দোবস্ত তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী করতো। ফলে নাকে খত দিয়ে তৃণমূলে প্রকাশ্যে যোগদান না করে নিস্তার ছিল না।

রাজ্যের এই 'হাড় হিম করা' সন্ত্রাসের প্রতিকল্পে মোদী-অমিত শাহের জনসভাগুলি তাদের কাছে শ্বাসবায়ু নেওয়ার মঞ্চ তো বটেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস-পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি পরিস্থিতি নিয়ে ঘোরতর উদ্বিগ্ন। এমনকী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়ে এরাজ্যে প্রতিনিয়িত বিজেপি কর্মীদের ওপর লাগাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। রাজ্য জুড়ে আর্থিক প্রতারণা, সন্ত্রাস, সিন্ডিকেট রাজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ।

তাই তৃণমূলের চোখ রাঙানি আপাতত আর কার্যকরী হচ্ছে না, যে কারণে নরেন্দ্র মোদীর জনসভা ভিড়ে উপচে পড়ছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর রক্তচাপ বাড়ছে। ঝড়ের স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা পাঁচ বছর ধরে অপ্রতিহত অর্থাৎ নট আউট, আবহবিজ্ঞান (প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক)-এ এমন বেনজির ঘটনা কেউ কোনওদিন শুনেছে!

রাজনৈতিক ক্যাডারদের বোধবুদ্ধির উদয় হোক এবং সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসুক

রাজু সরখেল

হিংসা, লাঠালাঠি, খুনোখুনি, মারামারি, অপহরণ, গুলি এখন রাজনৈতিক অলংকার। এই অলংকারকে জড়িয়ে দলগুলি হিংসায় মেতে উঠেছে। এই নির্মম ও জঘন্য অপরাধ থেকে রাজনৈতিক ক্যাডাররা বের হয়ে আসতে পারছে না, এটাই আশ্চর্যের বিষয়! এই কবে শুধরোবেন নেতারা? প্রতিটি নির্বাচনে বাঙ্গলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম আকার নেয় কেন? এই প্রশ্ন এখন সকলের। দেশের অন্যান্য রাজ্যে ভোট শান্তিপূর্ণ হলেও একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিগত দিনের বিহারের জঙ্গলরাজকেও হার মানিয়েছে। তাই ঘরে ঘরে মমতা ব্যানার্জি এখন বহুল চর্চিত মুখ্যমন্ত্রী। লজ্জার বিষয় হলো, মমতা ব্যানার্জির দল জঙ্গলরাজের জন্য একশো শতাংশ দায়ী। একথা উনি স্বীকার করতে চান না। ওকে বাঙ্গলার মানুষ সর্বজান্তা বলেই জানে। অথচ ওর দলের নেতারা কর্মীদের দিয়ে ছাপ্পা ভোট ও ভোটলুট করাচ্ছে, সন্ত্রাস চালাচ্ছে, গাড়ি ভাঙচুর করাচ্ছে, এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। তিনি জেনেও চুপচাপ আছেন আর দোষ দিচ্ছেন বিজেপির। তৃণমূল এতো সন্ত্রাসের পরেও যদি ২৩ মে ভোট গণনায় বাঙ্গলার রায় ওর বিপক্ষে যায় তাহলে তিনি অবশ্যই ধরনায় বসবেন এতে কোনো ভুল নেই। উনি বুঝে গেছেন পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে। তাই সন্ত্রাস চালিয়ে শেষ কামড়ের চেষ্টা করছেন। এই জন্যই তিনি এখন বেপরোয়া। তিনি ক্ষমতার লোভে সাধারণ থেকে বিরোধী সকলকেই পায়ে পিষে মারার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে অনুব্রত মণ্ডল তাঁর মুখ্য দোসর। এই অনুব্রত তাঁর দলের কর্মীদের মধ্যে পাচনবাড়ি বিলি, নকুলদানা বিলি, গুড় বাতাসা বিলি, খোল করতাল বিলি এবং প্রয়োজনে মাথায় বাড়ি দেবার নিদান দেন। তার এই উস্কানিমূলক কথাগুলি নিয়ে বহুবার মিডিয়ায় আলোকপাত করা হয়েছে কিন্তু অনুব্রতর কোনো হেলদোল নেই বা অনুব্রত শুধরোননি। বরং উল্টে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ওঁর মাথায় নাকি অক্সিজেন প্রবেশ করে না। লজ্জার বিষয় হলো, উল্টোপাল্টা বক্তব্যের জন্য এবার তাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী নজরবন্দি করেছিল। তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পার্টি অফিসে বসেই অন্যের মোবাইল বিন্দাস ব্যবহার করে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছেন। এই ভাবে কেউ মার দেবে, কেউ সহ্য করবে এই নীতি চলতে পারে না, তাই সব দল কমবেশি পাল্টা আক্রমণ শুরু ররেছে। ভোট এলেই রক্তবন্যা! এই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে রাজনৈতিক বন্ধুত্বে ভাটা পড়ে। পক্ষপাতিত্ব করে কিছু সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা, কলাকুশলী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন, এমনকী তা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। এটা কখনোই সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ নয়। মানুষ এগুলি কখনোই আশা করেনি। প্রকাশ্য জনসভায় নেতাদের বক্তব্যে শালীনতা থাকা উচিত। প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করলে কর্মীদের মধ্যে হিংসার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এতে ভয়ানক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন প্রতিবেশী, বন্ধু, ভাই, দাদা, কাকা, মা, বোন সকলেই। সম্প্রতি, চতুর্থদফা নির্বাচনে রাজ্যবাসী দেখেছে কীভাবে সন্ত্রাস চালালো তৃণমূল। প্রতিটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে তৃণমূলের সন্ত্রাসের কথা বারবার প্রচারিত হচ্ছিল। আসলে সত্য কখনো চাপা থাকে না। এতদিন আমরা কিছু মিডিয়াকে তৃণমূলের পক্ষপাতিত্ব করতে দেখেছি এখন তারা তৃণমূলের নিন্দায় সরব হয়েছে। কেন? আসলে ভাঁওতাবাজের রাজনীতি ও মিথ্যার বেসাতি বেশিদিন চলে না। বাঙ্গলার জনতাজনার্দন এবারে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আগে মমতা ব্যানার্জির বক্তব্য শোনার জন্য মানুষ মুখিয়ে থাকত, এখন তাঁর বক্তব্য কেউ পছন্দ করেন না, কিন্তু মোদীজীর বক্তব্য মিডিয়া প্রচার করলে সবাই মনযোগ সহকারে শোনেন। কারণ বক্তব্যেই ধরা পড়ে কার পেটে কত বিদ্যা। শিষ্ঠাচার, শালীনতা, ভাষাজ্ঞান, মার্জিত বক্তব্য সবই সুশিক্ষার অঙ্গ। একসময় মমতা ব্যানার্জি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রামকৃষ্ণের বাণী বলতেন কিন্তু এখন শুধু মোদীর নামে গালিগালাজ করেন। তিনি বাঙ্গলায় মোদীজীর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ছাড়লেন। কথায় বলে, কোনো ভক্ত যদি ভক্তি দিয়ে বা অভক্তিতেও ভগবানকে ডাকেন, তাঁর ডাকে ভগবান অবশ্যই সাড়া দেন। মমতা ব্যানার্জির আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোদীজী বাঙ্গলায় সতেরো বারের মতো এলেন। তিনি চুপিচুপি কুর্তা-পাজামা মোদীজীকে পাঠান, আবার রসগোল্লাও পাঠাবেন বলেছেন। শুধু আমরাই অকারণে ভাই-ভাই, বন্ধু-বন্ধু, প্রতিবেশীরা রাজনীতির রঙ গায়ে মেখে হিংস্র হয়ে একে অপরকে খুন করি, গালাগালি দিই, ভোট দিতে দিই না।

রাজনৈতিক ক্যাডারদের বোধবুদ্ধির উদয় হোক এবং সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসুক। পাশাপাশি ভোট দানের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। ■

শিষ্ঠাচার, শালীনতা, ভাষাজ্ঞান, মার্জিত বক্তব্য সবই সুশিক্ষার অঙ্গ। একসময় মনতা ব্যানার্জি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রামকৃষ্ণের বাণী বলতেন কিন্তু এখন শুধু মোদীর নামে গালিগালাজ করেন। তিনি বাঙ্গলায় মোদীজীর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ছাড়লেন।

চিঠিপত্র

বাংলাদেশে মোদীর জন্য হোমযজ্ঞ

বাংলাদেশের হিন্দুরা বুঝে গেছেন ভারতের মোদী সরকার তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা। তাদের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে তারা খুবই চাপের মধ্যে আছেন। তাই ভারতে যদি একজন নরেন্দ্র মোদীর মতো তেজি, হিন্দুত্বের নায়ক সরকার গঠন করে তবে তারা যে আশার আলো দেখবে সেকথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে সেখানকার হিন্দুরা যে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে নেই সেটা তাদের হোম যজ্ঞের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে মনে প্রাণে চাইছে। তাতে তারা আশার আলো দেখবে। সেটাতে কোনো ফাঁক ফোকর নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ সেখানে দুষ্কৃতীরা হিন্দুদের ভারতে চলে আসতে বাধ্য করছে। বিভিন্ন স্থানে ধ্বনি তুলছে 'পালা শালা মালাউন ভারতে পালা।' ওখানে নারী নির্যাতন, মেয়ে-বৌকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ এবং জোর পূর্বক ধর্মান্তরকরণ দিনের পর দিন লেগেই আছে। এ বিষয়ে সরকারের হেলদোল নেই। ওদেশের সরকার মনে প্রাণে চাইছে নরেন্দ্র মোদী যেন সরকার গঠনের ধারে কাছে যেতে না পারে, তবেই তাদের সোনায় সোহাগা। তবে সেটি যে এবার হচ্ছে না একথা একবাক্যে বলা যায়। তাই এদেশের কিছু নেতা-নেত্রী বিজেপিকে গোরুর সরকার, টুপিখোলা সরকার বলে কটাক্ষ করছে। এবার ভারতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই জাতীয়তাবাদী নায়ককে আবার সরকারে আনতে বদ্ধপরিকর।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

হীরক রানির দেশে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় সকল সময়ই পাথরবাজি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দিকে নিশানা করে। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে নিজেকে সর্বভারতীয় নেতা বলে লোকে মনে করে। তাঁর অকথা-কুকথা ভরা নোংরা বাচনভঙ্গি বাঙ্গালির মাথা নীচু করে দেয়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত নোংরা সংঘাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা যেতেই পারে শালীনতার সীমা রেখে, কদর্যতা পরিহার করে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ডিক্টেটর, হিটলার, চিচেস্কু, গব্বর সিং ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে কেবল দু'একটি তথ্য তুলে ধরছি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাটআউট, ফ্লেক্স, ব্যানার ইত্যাদির প্রতিচ্ছবিতে সারা কলকাতা মুখ ঢেকেছে। শুধু কলকাতা নয়, সমস্ত রাজ্য। শুধু তাঁর নয়, সঙ্গে ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। বক্তব্য পরিষ্কার। মমতা দিল্লি যাবেন, রাজ্যে অভিষিক্ত হবেন ভাইপো। বছরের পর বছর এই স্থায়ী চিত্রসমারোহ সবাইকে সহ্য করতে হচ্ছে। এ সমস্ত অল্প সময়ের সাময়িক বিজ্ঞাপন নয়। বিজ্ঞাপনদাতাগণ কলকাতা শহরে বা অন্যত্র এর জন্য বৃহৎ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করেন। কিন্তু তৃণমূলের এই হোর্ডিংসমূহ কীভাবে সরকারি পরিধিতে বিনা মাশুলে স্থান পায়? ভারতের আরও ২৯টি রাজ্যের কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর এরকম চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেই। অবশ্য স্তালিন, মাও-দে-জং, কাস্ত্রো, পলপট প্রভৃতি নেতার ছবির ব্যাপার আলাদা। কালীঘাটের মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে চোখ বন্ধ করে প্রণাম করে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি সামনে এক প্রকাণ্ড কাটআউট। অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা দেখিয়েছেন এক প্রফেসরের এক অতি নির্দোষ, নির্মল কার্টুন চিত্র পরিবেশনের অপরাধে। এখন সেই ক্ষমতার অপব্যবহার আরও ব্যাপক। 'ভবিষ্যতের ভূত' সিনেমাটি সেন্সর বোর্ড দ্বারা অনুমোদনের পরে নিয়মিত রূপে প্রদর্শন আরম্ভ হয় বিভিন্ন চিত্রগৃহে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারো কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল সিনেমাটিতে অনেক সত্যাশ্রয়ী ঘটনা আছে যা তৃণমূলের অনেক অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপের উদ্ঘাটন করে। হঠাৎ পরের দিনই সমস্ত সিনেমা হলো থেকে ছবিটি অদৃশ্য। হীরক রানির দেশে এরকমই হয়।

—পবিত্র চৌধুরী,
৫৩/২, প্রতাপাদিত্য রোড,
কলকাতা-২৬।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা

মালদহের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় চরম দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। বিগত বছরের পরীক্ষার রেজাল্ট ১১-১২ মাস পরেও পূর্ণাঙ্গাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা হওয়ার ৯-১০ মাস পর থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রেজাল্ট প্রকাশ করার তামাশা শুরু করে। প্রতি ২-৩ মাস অন্তর অন্তর ব্যাপক ভুলে ভরা রেজাল্ট প্রকাশ করতে থাকে। এবং পূর্ণাঙ্গ রেজাল্ট কোনোদিনই বিশ্ববিদ্যালয় বার করতে পারবে না। গত বছরের রেজাল্ট প্রকাশ সম্পূর্ণ না করেই ২০১৯ সালের স্নাতক স্তরের পরীক্ষা নেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রায় ১৪-১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে। বিগত ৭-১০ বছরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধীন সামসী কলেজ, চাঁচল কলেজ, হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ, গাজোল কলেজ, পাকুয়াহাট কলেজ, হরিরামপুর কলেজ, ইটাহার কলেজ প্রভৃতিতে ব্যাপক টোকুটুকিতে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্নাতক স্তরের পরীক্ষার্থীরা গোছা গোছা ফোটোকপি নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকছে এবং প্রকাশ্যে নকল চালাচ্ছে। প্রতিটি কলেজের পরীক্ষা কক্ষের মেঝেতে বস্তা বস্তা নকলের কাগজ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মালদা জেলার কলেজগুলোর আশেপাশে প্রচুর সংখ্যায়

ফোটোকপির দোকান গজিয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাইক্রো ফোটো কপি করার বিনিময়ে প্রতিটি দোকান প্রতিটি স্নাতক পরীক্ষার সময় লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে নিচ্ছে।

দু' বছর আগে এই তীব্র নকলকে আটকানোর জন্য প্রতিটি পরীক্ষার কক্ষে সিসিটিভি বসিয়েছিল। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর স্বাগত সেন পরীক্ষা কক্ষ থেকে সেই সিসিটিভি ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন। ফলে আগের তুলনায় নকলের তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। পরীক্ষা কক্ষে সিসিটিভি বসালে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় এই অজুহাতে পরীক্ষা কক্ষ থেকে সিসিটিভি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হলেও কলেজের পরীক্ষার্থীরা সেন্টার ফি বাবদ প্রায় কোটি টাকা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে জমা করছে। পরীক্ষা শেষে সেই কোটি টাকা কলেজগুলোর অধ্যাপক, পার্ট টাইমার, অশিক্ষক কর্মী, কলেজের হেডক্লার্করা ১০-১৫ হাজার করে টাকা নিয়ে নিচ্ছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অথবা টিআইসি'রা সেন্টার থেকে প্রতি বছর ২৫-৩০ হাজার করে টাকা নিয়ে নিচ্ছে। পরীক্ষা চালানোর নামে প্রত্যেকেই সেন্টার ফি বাবদ আদায় অর্থে লুটপাট চালাচ্ছে। সেন্টার ফি-র টাকা দিয়েও মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কলেজ গুলোতে সিসিটিভি বসালে নকল করায় লাগাম পড়ানো যেত। একদিকে নকল চলছে, দোকানদাররা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে, সেন্টার ফি-র টাকা লুটপাট হচ্ছে, অন্যদিকে, ১২-১৪ মাস পরেও রেজাল্ট প্রকাশ হচ্ছে না। গোটা ভারত গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান কেলেঙ্কারিতে সর্বাগ্রে। পরীক্ষার সময় ডিউটি করবার জন্য বাইরে থেকে লোকজনকে আনা হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মালদহের কলেজগুলোতে নকল চললেও এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ধ্বংস হয়ে গেলেও কেউই দায়বদ্ধ স্বীকার করছে না।

—**শুভ্র সান্যাল,**
ইংরেজবাজার, মালদহ।

বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট ও দেশদ্রোহী কংগ্রেস

কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের রাজনীতির আঙ্গিনায় একপ্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক তৈরি করে সংসদীয় রাজনীতির হাতে-খড়ি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে একটানা ৩৪ বছর রাজত্ব করে গেল, কিন্তু কংগ্রেস কমিউনিস্টদের গোপন আঁতাত পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোদিনই টের পেল না। একটু ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১৯৬২ সালে চীনাপ্রেমে গদগদ তৎকালীন প্রধামন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের সব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশকে একটা সর্বনাশা খাদের কিনারায় এনে দিলেন। সেই সময় ভারতের কমিউনিস্টরা নেহরুর এই বালখিল্য আচরণের প্রতি সমর্থনপুষ্টযোগ্য সঙ্গত দিয়ে গেলেন। সেই সময় চীনাসেনারা ভারতের সীমানায় ঢুকে যখন ঘাঁটি বানাতে আরম্ভ করলো তখন নেহরু 'হিন্দি চীনি ভাইভাই' স্লোগানে মত্ত। যখন হুঁশ ফিরলো তখন দেখলেন চীনা সৈন্যরা আমাদের অরুণাচল প্রদেশের ২৫০০০ হাজার বর্গকিলোমিটার ঢুকে পড়েছে বিনা বাধায়। চীনা সৈন্যবাহিনীর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে অরুণাচল প্রদেশের ২৫০০০ হাজার বর্গকিলোমিটার এক প্রকার উপঢৌকন দিয়ে ফিরে এলেন। এই নেহরু যে নিজেকে একজন কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী ভাবতে ভালোবাসতেন সেই নেহরু কমিউনিস্ট চীনের নিকট এইরূপ প্রত্যাঘাতের অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। আর ভারতের কমিউনিস্টরা লালফৌজ বন্দনায় এত মত্ত যে চীনা আক্রমণের সময় চীনা সেনাদের 'মুক্তিসেনা' বলে 'ওয়েলকাম' জানানোর প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন। জনসঙ্ঘকে নেহরু 'হিন্দুজাতীয়তাবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করে বসেন আর কমিউনিস্টরা 'ফ্যাসিস্ট' তকমা লাগিয়ে দেন। এটা ছিল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের গোপন বোঝাপড়া। আর 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রশ্নে এই দুটি দল কতটা নৈকট্য স্থাপনে কৌশলী ছিল তার উদাহরণ হলো, ১৯৮৫-র কংগ্রেসের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন--- 'কংগ্রেস সরকারের 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতির লক্ষ্য হলো ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ছেদ ঘটানো।' এখানে একটা প্রশ্ন এটা শুধু রাজীব গান্ধীর লক্ষ্য ছিল তা নয়, রাজীব গান্ধীর মাতামহ জওহরলাল নেহরু এবং মাতা ইন্দিরা এই একই পথের পথিক ছিলেন। আর আজকের রাজীব পুত্র কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসের পতাকার সঙ্গে যখন পাকিস্তানের চাঁদ-তারা সবুজ পতাকা নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত তখন ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জাগবে তারা কি 'ধর্মনিরপেক্ষতার' প্রতীক না আর একটা ধর্মান্ধ মুসলমান দেশ বানানোর প্রতিনিধি? কংগ্রেস সিপিএমেরই পদাঙ্ক অনুস্মরণ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে কেরলে মুসলিম লিগের সঙ্গে মোর্চা করেছিল। সিপিএম বলে জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তিকে আটকাতে কম সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোটা কোনো অন্যায়ের মধ্যে পড়ে না। এখানে বলে রাখা দরকার 'জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট' শক্তির আগে পিছু আজকের এই হিন্দুশব্দের বসানো তখনো খোলাখুলি কংগ্রেসের ও সিপিএমের মধ্যে প্রচলন ছিল না আজ তারা এই শব্দটি প্রকাশ্যে বলছে বা বলতে বাধ্য হচ্ছে। সিপিএমের এই 'হিন্দুজাতীয়তাবাদ' বিরোধিতা কংগ্রেসের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতির বোঝাপড়ার ফসল ছাড়া আর কী? আজকের কমিউনিস্টদের চোখে ভারতবর্ষে 'হিন্দুজাতীয়তাবাদী' শক্তির উত্থানে মার্কসবাদ প্রসারে প্রধান অন্তরায়। এই শক্তিকে নির্মূল করতে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া আগে ছিল আজ তা প্রকট। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এবং বিজেপির প্রতি মানুষের দিনদিন আস্থা বাড়ায় কংগ্রেস ও সিপিএম অন্য এক রাজনৈতিক ফায়দা তোলার নাটক করা ছেড়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে ব্যস্ত।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

অঙ্গনা

ভয় নয়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলতে হবে মহিলাদের

ড. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং প্রতিদিনকার খবরে কোথাও না কোথাও মহিলাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে যাতায়াতের পথে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি ফেরা, রক্ষণশীল পোশাক পরা এগুলি কোনও সমাধান নয়। এসব মেনে চলা সত্ত্বেও বহু মেয়েকে প্রতিদিন বাসে-ট্রেনে-রাস্তায় হেনস্থার শিকার হতে হয়। তাই যা বদলাতে হবে তা হলো সমাজের মানসিকতা, আর তার সঙ্গে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

একা রাস্তাঘাটে চললেও নিজেকে অপরাধী ভাবার কোনও কারণ নেই। কথা বলার ভঙ্গি, বডি ল্যাংগুয়েজে যেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকে। বেশিরভাগ হেনস্থাকারীই কাপুরুষ হয়। এদের মোকাবিলা করতে গেলে ফাইটিং স্পিরিট থাকা জরুরি। আত্মরক্ষার প্রথম কথাই হলো উপস্থিত বুদ্ধি। এটা ঠিক যে বিপদে পড়লে বোধবুদ্ধি কাজ করে না। তবে সে সময় শান্ত মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে সেলফোনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সেটাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য এমন কারো নাম্বার রাখতে হবে যারা সক্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন স্টেপ নিতে পারে। এছাড়াও এখন বিভিন্ন অ্যাপ ডাউনলোড করা যাচ্ছে সেগুলোর ব্যবহারও জেনে নেওয়া উচিত। এসব সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বিপদ অনেক সময় এসেই যায়। তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। অটো, ক্যাব ইত্যাদি ধরার জন্য যেখানেই দাঁড়ান না কেন, আশেপাশের লোকগুলোকে ভালোভাবে দেখে নিন। লক্ষ্য রাখুন আপনাকে বারে বারে কেউ ফলো করছে কিনা। শেয়ার ট্যাক্সিতে উঠলে সহযাত্রীদের চেহারা দেখে নিন। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির নাম্বার বিশ্বস্ত বন্ধু, মা-বাবা, ভাই-বোন যে কারও ফোনে পাঠিয়ে দিন। গাড়িতে কজন আছেন এবং কোন রুট থেকে উঠেছেন এগুলোর একটা সঠিক তথ্য নোট করে রাখুন। মনে রাখবেন, রাস্তাঘাটে চলার সময় অন্যমনস্ক হলে চলবে না। এতে কিন্তু বিপদ হতে পারে। আমাদের মনে হতে পারে যে, আমরা এমন সমাজে বাস করি যেখানে চলাফেরা করার সময় মেয়েদের হাতে অস্ত্র রাখতে হবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সমাজের প্রতিটি মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই নিজেকে রক্ষা করতে ছোটোখাটো জিনিস রাখাই যায়। বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি যখন কাজের সূত্রে প্রথম মুম্বই গিয়েছিলেন তখন তাঁকে ভাড়া গাড়িতেই যাতায়াত করতে হতো। তখন তিনি নাকি ট্যাক্সিতে উঠেই চালকের থেকে জেনে নিতেন কতক্ষণ লাগবে তার গন্তব্যে পৌঁছতে। সময় বেশি লাগলে তিনি চোখ বুজে কাজের কথা ভাবতেন, আর হাতের কাছে একটা ছোটো হাতুড়ি রাখতেন। যাতে কোনও সমস্যা হলে সেটি সহজেই কাজে লাগানো যায়। তাই মহিলারা পথেঘাটে চলাফেরা করার সময় পিপার স্প্রে বা প্যাকেট বডি স্প্রে সঙ্গে রাখতেই পারেন। যদি জিন্স পরেন তাহলে তার পকেটে এই স্প্রে রাখা সবচেয়ে ভালো। 'কাহিনি' ছবিতে বিদ্যাবালানের শেষ দৃশ্যের কথাটি মনে করুন। মাথার চুলে প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহৃত সুচালো কাঁটা তিনি কীভাবে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। মহিলারা এভাবেই কলম, মোটর সাইকেল, সাইকেল বা ঘরের চাবি, চুলের কাঁটা ব্যবহার করতে পারি। মুখমণ্ডলের বা শরীরের যেকোনও মর্মস্থানে আঘাত করলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রতিপক্ষ ঘাবড়ে যাবে, ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে। অনেক সময় বাসে ট্রেনে বা কোনও যানবাহনে যাবার সময় যদি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি সে পুরুষ কিংবা মহিলা হোক যেচে আলাপ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। এরপরও গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইলে চিৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

এখন কমবেশি সব মেয়েই নিজেকে ফিট রাখতে ব্যায়াম করে। মার্শাল আর্ট কিন্তু শরীরে পক্ষে উপযোগী ব্যায়াম। সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে শিখে রাখা জরুরি। বাড়ির ছোটো মেয়েকেও শিখিয়ে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এত কিছুর পরেও একটা কথা, প্রতিটি বাড়ির অভিভাবক যদি ছোটো থেকেই ছেলে-মেয়েদের লিঙ্গবৈষম্যের ভুল ধারণা কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে সেই পরিবারে কোনও পুরুষের মধ্যেই কোনও খারাপ চিন্তাভাবনা তৈরি হবে না। সেই সঙ্গে ছোটোদের শিখিয়ে দিতে হবে 'গুড টাচ' ও 'ব্যাড টাচ' কী। এবিষয়ে ছোটো থেকেই তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। কারণ ছোটো থেকে বড়ো সবাই কোনও না কোনও ক্ষেত্রে হেনস্তার শিকার হয়ে পড়ে। তাই প্রথমে পরিবার থেকেই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটা সন্তানকে দিতে হবে।

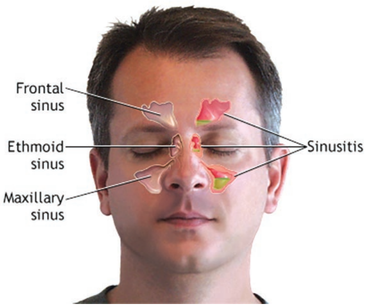

সাইনোসাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

নাক ও চোখের চারপাশে হাড়ের ভিতরের বায়ুপূর্ণ কুঠুরিকে সাইনাস বলা হয়। যখন এই সাইনাসগুলোতে সংক্রমণ হয় তখন তাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস। আইটিস অর্থ ইনফ্লামেশন। প্রধান সাইনাসগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

কপালের দুই পাশে ২টি ফ্রন্টাল সাইনাস, চোখের নীচে দুই পাশের দুইটিকে ম্যাক্সিলারি সাইনাস, মাথার মধ্যে স্ফিনয়ডাল্স এবং ইথময়ডাল সাইনাস রয়েছে। ইথময়ডাল সাইনাসের সংখ্যা অধিক এবং তা সংখ্যা ১০ থেকে ১৩টি পর্যন্ত হতে পারে। সাইনাসগুলোর সঙ্গে মধ্য কর্ণের এবং নাকের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। এদের মূল কাজ— বায়ুকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে মাথার হাড়কে হালকা রাখে। শব্দ এবং গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে ইত্যাদি। মাথার মধ্যে যদি এই বাতাস না থাকতো তাহলে এই মাথা নিয়েই আমাদের চলাফেরা করা সম্ভব হতো না। সাইনাসে সংক্রমণ হলে নাক দিয়ে সর্দি ঝরতে পারে, মাথাব্যথা করতে পারে। সাইনাসের মধ্যে পুঁজ জমতে পারে, টিউমার হতে পারে ইত্যাদি। যদি কারও সাইনোসাইটিস ১২ সপ্তাহের বেশি সময়কাল সমস্যা করে তখন তাকে ক্রনিক সাইনোসাইটিস বলা হয়। এই সমস্যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই হতে পারে। এই সমস্যায় নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মাথা ধরা, মাথা ব্যথা করতে পারে। সাধারণত ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে সাইনাসজনিত সমস্যা হয়ে থাকে।

ফাংগাস, অ্যালার্জিজনিত কারণেও সাইনোসাইটিস সৃষ্টি হয়। রিস্ক ফ্যাক্টরের সংখ্যা এক বা একাধিক। যার মধ্যে অন্যতম নাকের হাড় বাঁকা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, পলিপাস, অ্যাজমা, এসপিরিন জাতীয় ওষুধ। প্রকৃতি থেকে ধুলোবালি, কলকারখানার ধোঁয়া, সুগন্ধি, ঝাঁঝালো গন্ধ, মরিচের গুঁড়ো, ধূমপান, দন্ত রোগসহ আরও অনেক কারণের জন্য রাইনোসাইনোসাইটিস হতে পারে। গ্যাস্ট্রো এসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, পোস্ট নেজাল ড্রিপসিন্ড্রম ইত্যাদি কারণও জড়িত থাকতে পারে।

উপসর্গ : নাক বন্ধ থাকা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরা, নাকের মধ্যে সুড়সুড় করা, চুলকানো, চোখ চুলকানো, চোখ দিয়ে জল পড়া, মাথা ধরা, ব্যথা করা, নাকের গন্ধ-বাসনার অনুভূতি লোপ পেতে পারে। চোখ ঝাপসা হয়ে যাওয়া, খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যায় না, সর্বোপরি জ্বরও হতে পারে। আহারে অরুচি আসতে পারে, দাঁত ব্যথা করতে পারে। নাক-কান-গলা এর মধ্যে একটির সঙ্গে অন্যটির সংযোগ রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

নাকের এক্স-রে করলে প্যারান্যাজাল সাইনাসের সমস্যা, নাকের হাড় বাঁকা বোঝা যায়। রক্তের রুটিন পরীক্ষা, অ্যালার্জির পরীক্ষা করা ইত্যাদি করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা : এক কোর্স এন্টিবায়োটিক, এন্টিহিস্টামিন প্রয়োজনে মন্টিলুকাস্ট, কিটোটিফেন, অক্সি বা জাইল মেটাজলিন নাকের ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ করে যাদের নাক বন্ধ থাকে তাদের ক্ষেত্রে কার্টিকোস্টেরয়েড নাকের স্প্রে পর্যন্ত দিতে হয়। যেহেতু অ্যালার্জির জন্য একাধিক ফ্যাক্টর থাকে কাজেই ওষুধও একাধিক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ২ সপ্তাহের বেশি অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহারেও যদি ভালো ফল না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ওষুধের গ্রুপ বদল করতে হয়। মেনথল ভ্যাপার সকাল-বিকাল ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। তারপরও যদি কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া যায়, নাক-কান- গলা বিশেষজ্ঞগণ অ্যান্ট্রাল ওয়াশ পর্যন্ত করেন। সেটিও একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে।

অ্যালার্জিজনিত সমস্যায় রোগীরা মেডিসিন, নাক-কান, গলা এবং বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞগণের চিকিৎসা নেন। তবে সবার আগে একজন রেজিস্ট্রার ফিজিশিয়ানের নিকট যাবেন। তিনি রক্তে রুটিন পরীক্ষা, অ্যালার্জির পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে করে রোগী কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট গেলে উপকৃত হবেন তার পরামর্শ দেবেন।

যারা দীর্ঘমেয়াদি রাইনোসাইনো-সাইটিসে আক্রান্ত তাদের জীবনযাত্রার মানে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন— ঠাণ্ডা খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগানো নিষেধ। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় এমনকী কর্মক্ষেত্রে সাধারণ মাস্ক নয়, সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করবেন। বাড়িতে লোমশ গৃহপালিত জীব-জন্তু পোষা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে সুতির কাপড় ব্যবহার করতে হবে। কার্পেট ব্যবহার করা যাবে না। কেরোসিন বা কাঠের উনুন ব্যবহার করা যাবে না। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং বিশুদ্ধ জল পান করতে হবে। ধূমপান করা যাবে না। এমনকী উক্ত বাড়িতে ধূমপায়ী বাস করলেও পরোক্ষভাবে রোগীর সমস্যা থাকবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত ও প্রয়োজনমতো ব্যায়াম খেলাধুলা, কায়িক পরিশ্রম করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। তারপরও যদি সাইনোসাইটিস থেকে মুক্তি না মেলে তখন অপারেশন পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই সমস্যার সমাধান সহজে হয়ে যায়।

যোগাযোগ : ৯৮৩০০২৩৪৮৭

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে
বিজেপি প্রার্থী
অধ্যাপক ডঃ অনুপম হাজরা কে
১ নম্বর বোতাম টিপে
পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে
জয়ী করুন

দিদি চান বা না চান দিন বদলাবেই

অমর ভৌমিক

চতুর্থ দফা ভোটের দিন দুপুরে টিভিতে দেখেছিলাম, একটা বুথের কাছে রিপোর্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করছেন এক ভদ্রলোক। কথায় কথায় বোঝা গেল, তিনি কোনও বিরোধী পার্টির এজেন্ট, সম্ভবত কংগ্রেসের। 'দেখুন দাদা কী করে যাচ্ছে। আমায় টেনে হিঁচড়ে উঠিয়ে দিল, বুথ থেকে বের করে দিয়েছে। লোকজন নিয়ে ছাপ্পা মেরে যাচ্ছে সেই দশটা থেকে।'

---কে করছে, কোন লোকটা? প্রশ্ন করলেন রিপোর্টার।

—ওই যে, বড়ো গাছটার তলায় দাঁড়ায়ে আছে। আপনাদের দেখে উখানে চলে গেছে, যেন কিছু জানে না!

—কোন পার্টির লোক?

---কোন পার্টি আবার, টিএমসি। কমিশনের বাবুরা ওকে বারণ করে দিচ্ছে বুথে ঢুকতে। ও কোনও কথা শুনে না, কারুর না।

রিপোর্টার ছেলেটি বেশ সাহসী। বললেন : চলুন তো দেখি একটু কথা বলি। আসুন, আপনার সঙ্গেও কথা বলিয়ে দিই। আরে ভোটটা তো করতে হবে।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে যেন ভিজে বেড়াল। —আরে আপনি এখানে কী করছেন, আপনাকে তো আসতেই বারণ করেছে কমিশন— বুম বাগিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন রিপোর্টার।

---কই কিছু করছি না তো। আমার পরিবারের লোকেরা গেছে ভোট দিতে। ওদের নিয়ে বাসায় ফিরব।

—মিথ্যা কথা বলছে। এই দেখুন স্যার, আমি ছবি তুলেছি, এই দেখুন ঘরের ভিতর ভোটবাবুদের পাশে, ভোটারদের লিস্ট দেখছে। ওর চারপাশে সব ওদেরই লোক।

—ওর ছবি মিথ্যা। বাজে ছবি তুলেছে দাদা। আমি বুথে ঢুকিনি। এখানে ছিলামও না। বাড়ির লোকদের ভোট দেওয়াতে নিয়ে এসেছি। হয়ে গেলে চলে যাব।

রিপোর্টার হেসে বললেন : কী বলছেন আপনি! ছবি কি কখনও মিথ্যা হয়!

আরও খানিক বোঝাবার চেষ্টা করল সেই ছাপ্পা-ম্যানেজার। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যি বলতে, কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। তাহলে কি মিডিয়ার অবলুপ্ত শিরদাঁড়া নতুন করে গজিয়ে উঠছে? তৃণমূল নামক অদ্ভুতুড়ে পার্টিটা ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে ওরা সবকিছু গ্রাস করার অভিযানে নেমেছে, তাতে ভোটের সময়ে এমন সাহসী রিপোর্টিং ধাঁধা লাগায় বইকি। মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের কেষ্ট ওরফে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলকে রিপোর্টার জিজ্ঞেস করছেন, ভোট তো শেষ হয়ে এল। আপনি তাহলে কী বলবেন, কার জয় হলো? আধা সেনা, না নকুলদানা? একগাল হেসে মুণ্ডিত-মস্তক কেষ্টবাবু বলে দিলেন--- নকুলদানার জয়।

এই ধরনের কথাবার্তা— সাংবাদিক খোঁচা মারছেন, হেসে হেসে সেই খোঁচা হজম করছেন শাসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা নেতা—এমন দৃশ্য যে কতকাল দেখিনি! সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি মিডিয়া নাকি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কী জানি বাবা অত বুঝি না। তবে কয়েক বছর আগে অবধি বাংলা কাগজ আর টিভি চ্যানেলগুলো যেসব রিপোর্টিং করত, ছবিটবি দেখাত, মানুষ সেগুলো দেখতে আর পড়তে চাইত বলেই মনে হয়। বামফ্রন্টের জমানায় সবক'টা বড়ো কাগজে রাইটার্সের হাঁড়ির খবর টেনে বের করার স্পেশাল রিপোর্টার ছিল বলে শুনেছি। তাদের কাজ ছিল, সরকারের কাজকর্মের ছ্যাঁদাগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা আর হাটে হাঁড়ি ভাঙা। বেজায় চটে যেতেন সিপিএম আর বামফ্রন্টের কেষ্টবিষ্টুরা। খবরের কাগজ আর চ্যানেলের মালিকপক্ষের কাছে নালিশও যেত। মালিকরা রিপোর্টারকে ডেকে একটু বকে-টকে দিতেন। তারপর আবার যে কে সেই। বামফ্রন্টের আমলে সিটুর অত্যাচারে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেইসব প্রতিবেদন হাত খুলে রিপোর্টাররা লিখতেন আর পেল্লায় সাইজের হেডিং দিয়ে ছাপতেন নিউজ এডিটররা। দু-একটা স্পেশাল কেস ছাড়া ওইসব তদন্তমূলক রিপোর্টিংয়ে মালিকরা হস্তক্ষেপ করতেন বলে শুনিনি। চন্দন বসুর ব্যবসা বাড়াতে বেঙ্গল ল্যাম্পের বাল্ব অর্ডার নিয়ে জ্যোতি বসু আর যতীন চক্রবর্তীর সেই ঐতিহাসিক মল্লযুদ্ধ— সেও তো বাঙ্গালি জেনেছিল খবরের কাগজের কল্যাণেই। বামফ্রন্টের অনেক দোষ ছিল। কিন্তু নিজেদের আর পার্টির স্বার্থে মিডিয়াকে গলা টিপে খুন করো— এমন জাতের ফ্যাসিজম তাঁরাও দেখাতে সাহস পাননি। অথচ কী অনায়াসে সেটা করলেন বাঙ্গলার স্বঘোষিত জনগণমন অধিনায়িকা! কখনও ধমকে, কখনও চমকে, কখনও সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে, বিভিন্ন হাউসে আঁচল ধরা কিছু লোককে শীর্ষে বসানোর অপারেশন চালিয়ে এই আট বছরে বাংলা সাংবাদিকতাকে যে স্তরে নামিয়ে আনা হলো, স্বাধীনতার পর থেকে মিডিয়ার এই ধরনের অসম্মান ভারতবর্ষ দেখেনি। শুনতে পাই, পরপর দু'বার কলকাতা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক ইলেকশনও কার্যত লাটে তুলে দিয়েছেন দিদি আর তাঁর দলবল। সেখানে

এখন রাজত্ব করছে জননেত্রীর পা-ধোয়া জল খাওয়া এমন কিছু লোক, মিডিয়া জগতে যাঁদের ট্র্যাক রেকর্ড আর কন্ট্রিবিউশনের বহর নিয়ে সকলে হাসাহাসি করে।

অর্থাৎ স্বাধনিভাবে চিন্তা করার কোনও অধিকারই কারও যেন না থাকে। কেউ যদি কোনও অপ্রিয় প্রশ্ন তোলে, তাকে বলা হবে মাওবাদী। তার হাউসের কর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে, যাতে তাকে অকিঞ্চিৎকর কাজ দেওয়া হয় অথবা একেবারে সরিয়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনচেতা সরকারি অফিসারদের হাতে ধরানো হচ্ছে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ের মতো বকচ্ছপ; কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কাজের অধিকার, যদিও প্রতিদিনই তাঁকে আসতে হবে অফিসে, বসে থাকতে হবে বিকেল অবধি, তারপর পাহাড়প্রমাণ অপমান আর গ্লানি মাথায় করে বাড়ি ফেরা। সে তো তবু সরকারি চাকরি। বেসরকারি মিডিয়া হাউসগুলোয় কী করে হাত বাড়ান মাননীয়া দিদি? কী করে সেখানে টার্ম ডিকটেট করেন?

করেন একটাই কারণে। দিদি ভালো করে বুঝে নিয়েছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে যে স্বৈরাচারী উপাদান আছে, ভালো করে জল-বাতাস লাগিয়ে তাকে সুপুষ্ট করতে গেলে সর্বাগ্রে চাই মিডিয়ার টোটাল কন্ট্রোল। একটাও বেসুরো প্রতিবেদন যেন সাধের রাজ্যপাটকে বিব্রত না করে। এই কাজ করতে গেলে সবার আগে দরকার খানকতক নিজের লোক, যাদের নানা কৌশলে বিভিন্ন হাউসের মাথার দিকে ঢুকিয়ে দিতে পারলে বাকিটা তারাই করে দেবে।

এই অবস্থা কি অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে? মুশকিল আছে। চিটফান্ডের কাগজ আর চ্যানেলগুলো মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় তাদের প্রোপাগান্ডা মেশিনারি একরকমভাবে চালাচ্ছিল। জনসাধারণকে বিস্তর ঠকানোর পর তারা যখন বেআইনি অর্থলগ্নির ব্যবসা আর সামলাতে পারছে না, পঞ্জি স্কিমের স্বাভাবিক নিয়মেই ভেঙে পড়ছে প্রতিষ্ঠানের কলকবজা, তখন রে-রে করে মাঠে নেমে পড়ল শাসক দল আর ধামাধরা সরকার। কোথায় গেল সারদা কোম্পানির কোটি কোটি টাকা? রাতের অন্ধকারে কারা আসা-যাওয়া করতেন মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে? কী তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়? দিদিমণির আঁকা পৃথিবী আলো করা ছবিগুলো কারা কোটি কোটি টাকায় কিনল— এসব প্রশ্ন হারিয়ে গেল মাটির নীচে এমন কোনও গোপন বাংকারে, যেখানে একবার ঢুকিয়ে ফেলতে পারলে সহজে আর বের করা যায় না।

> “স্বাধনিভাবে চিন্তা করার কোনও অধিকারই কারও যেন না থাকে। কেউ যদি কোনও অপ্রিয় প্রশ্ন তোলে, তাকে বলা হবে মাওবাদী। তার হাউসের কর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে, যাতে তাকে অকিঞ্চিৎকর কাজ দেওয়া হয় অথবা একেবারে সরিয়ে দেওয়া হয়।”

যতদূর মনে পড়ছে, চিটফান্ড কাণ্ডের পর থেকেই এ রাজ্যের মিডিয়াকে ধামাধরা প্রজাতি বানাতে শাসকরা একেবারে উঠে পড়ে নেমে পড়ে। ছোটো-বড়ো-মাঝারি কাগজ বা চ্যানেল— সম্রাজ্ঞীর নজর থেকে কেউ বাদ পড়ল না। তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে সবাইকেই। আনন্দবাজার, বর্তমান, টেলিগ্রাফ, এই সময়, আজকাল, এবিপি আনন্দ, জি ২৪ ঘণ্টা কেউ বাকি রইল না। সকলের মুখেই এক রা— দিদির জয়ধ্বনি করো আর বিজেপিকে ইট মারো। অনবরত বলতে থাকো, তোমরা সংকীর্ণ তোমরা সাম্প্রদায়িক। দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন যদি একই সুরে এতগুলো হাউস মিথ্যে প্রচার চালিয়ে যায়, রাজ্যের মানুষ তবে কোথা থেকে পাবে সঠিক খবর?

এত করেও মানুষকে বোকা বানানো যাচ্ছে কি? পিষে ফেলা যাচ্ছে কি মানুষের সত্যি জানার আগ্রহকে? সাতদফা নির্বাচনের প্রায় প্রথম থেকে ভোটকর্মীরা জানিয়ে দিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী না পেলে তাঁরা কাজ করবেন না। কারণ, তৃণমূলের ধামাধরা পুলিশকে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। হয়তো তাঁদেরই পথরেখা ধরে এতকাল বাদে একটু একটু করে লুকনো বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছেন মিডিয়ার বন্ধুরা, যাঁরা সক্রিয় না থাকলে গণতন্ত্র কথাটারই কোনও মানে নেই।

দেখা যাক, আড় ভেঙে ময়দানে নামার সদিচ্ছা আর সক্রিয়তা কতদিন অটুট থাকে। দিন তো বদলাবেই। দিদিমণি চান আর না চান।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে ‘রিসিভ’ করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

সঙ্ঘ এবং রাজনীতি

ড. মনমোহন বৈদ্য

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বলে আসছে যে এটি একটি সামাজিক সংগঠন। স্বাধীনতার পরেও সঙ্ঘের এই নীতিই বজায় থেকেছে, সেখানে কোনও পরিবর্তন আসেনি। ১৯৪৯ সালে যখন সঙ্ঘের নিজস্ব সংবিধান প্রস্তুত হয় তখন বলা হয়, সঙ্ঘের কোনও স্বয়ংসেবক যদি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চান তা হলে তিনি যে কোনও দলে যোগদান করে সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেন। এই সংবিধান ভারতীয় জনসঙ্ঘের স্থাপনার আগেই তৈরি হয়েছে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠিত হওয়ার পর অনেক স্বয়ংসেবক ও প্রচারক তাদের জন্য কাজ করলেও সঙ্ঘের এই নীতিতে কোনও বদল আসেনি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকাটাই স্বাভাবিক। সঙ্ঘ একটি সম্পূর্ণ সামাজিক সংগঠন হওয়ায় সমাজের কোনও ক্ষেত্রই তার কাছে অস্পৃশ্য থাকার কথা নয় এবং স্বয়ংসেবকরা সমাজের সকল স্তরে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাবে। সঙ্ঘের কিছু স্বয়ংসেবক রাজনীতি করেন বলে সঙ্ঘকে একটি রাজনৈতিক দল মনে করা অনুচিত। রাজনৈতিক দল সমাজের একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার বাইরেও সমাজের আরও অংশ থাকে। সঙ্ঘ যেহেতু 'সম্পূর্ণ' একটি সামাজিক সংগঠন তাই সমাজের কেবলমাত্র 'একটি অংশের' অংশীদার সে হতে পারে না।

Party stands for a 'part' and there is bound to be a 'counterpart'. Sangh stands for the entire society. Conceptually RSS and Hindu society are coterminus and psychological they are one. Then how can the 'whole' be a party to a 'part'.

১৯২৫ সালে সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ডাঃ হেডগেওয়ার অন্য স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সত্যাগ্রহ শুরু করার আগে তাঁর সহকারী ডাঃ পরাঞ্জপেকে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই সত্যাগ্রহের কারণে তাঁর এক বছরের কারাবাস হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল সঙ্ঘকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীগুরুজী এই প্রস্তাবে সহমত হননি, কারণ সঙ্ঘ একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে চায় না, বরং সম্পূর্ণ সমাজকে নিয়ে সংগঠন করতে চায়। রাজনীতিতে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় মতাদর্শগত দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঙ্ঘের কাছে এই শূন্যতা পূরণের আবেদন রাখেন। শ্রীগুরুজী তাঁকে পরিষ্কার ভাবে বলেন, রাজনীতির কাজ আপনি করুন, সঙ্ঘ আপনাকে সাহায্য করবে। কিন্তু সঙ্ঘ সমাজ সংগঠনের কাজই করতে থাকবে।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সরকার গঠনের সময় স্বয়ংসেবকদের গুরুত্বপূর্ণ যোগদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। বহু দলের মিলিত জনতা পার্টিতে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার মতো আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসার পরও তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী এই প্রস্তাব অস্বীকার করে বলেন যে, বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সঙ্ঘ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবার সঙ্ঘ তার নিজস্ব সমাজ সংগঠনের কাজই করবে। এই ভাবে, সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন তৈরি নয়, সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত করার পেছনে সঙ্ঘের ভূমিকাকে বুঝতে হবে।

সরকার্যবাহের আহ্বানে ২০১৮-র প্রতিনিধি সভায় সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক শ্রীমাধব গোবিন্দ বৈদ্য এসেছিলেন। সেইদিন তাঁর ৯৫-তম জন্মদিন ছিল। তিনি ১৯৩১ সালে ৮ বছর বয়সে স্বয়ংসেবক হন। তখন থেকেই তিনি বরাবর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁর এই অবদানকে মাথায় রেখে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক তাঁকে সম্মানিত করেন ও অভিনন্দন জানান।

অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'সঙ্ঘকে বোঝা সহজ কাজ নয়। পশ্চিমি দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব দিয়ে সঙ্ঘকে বোঝা সম্ভব নয়। ভারতীয় একাত্ম দৃষ্টির দ্বারাই সঙ্ঘকে বোঝা সম্ভব। ঈশোপনিষদের পঞ্চম শ্লোকে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদকার বলেছেন— 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।' এই আত্মতত্ত্ব স্থির এবং গতিশীল, এই আত্মতত্ত্ব দূরেও আছে, আবার নিকটেও আছে। এই তত্ত্ব সকলের অন্তরে আছে আবার সকলের বাইরেও আছে। উপরোক্ত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কখনই একটি রাজনৈতিক দল নয় বা কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ নয়। এটি সম্পূর্ণ সমাজের একটি সংগঠন। এই বিষয়টি ভারতীয় চিন্তনের একাত্ম দৃষ্টি আর ঈশোপনিষদের দৃষ্টি থেকে বোঝা সম্ভব।

বিষয়গুলি পরস্পরবিরোধী হলেও তা সত্য।

এই ধরনের ভাবনা সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন, আর সমাজের স্বরূপ হলো মিশ্র ও জটিল। সমাজে শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষা, সেবা, রাজনীতি, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। সম্পূর্ণ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষেত্রেরই সমাবেশ ঘটবে। সঙ্ঘ সমাজের কোনও একটি অংশের অঙ্গীভূত হতে পারে না, সঙ্ঘের কাজ সম্পূর্ণ সমাজের কাজ। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, রাজনীতি, সেবা, ধর্মীয় ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সক্রিয় হয়েও কোনও নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। সঙ্ঘ এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন। বেদের পুরুষ সূক্তে বর্ণনা করা আছে তিনি পৃথিবী সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়েও তাঁর দশটি আঙুল বাকি থাকে--- সে ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

এই বিষয়টিকে পরমাণু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যেতে পারে। এক সময় বিজ্ঞানীরা বলতেন পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু পরে দেখা গেল অণুকে ভাঙা যায় এবং সেটির মধ্যে তিনটি কণা রয়েছে--- ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। আরও পরে বলেন এগুলি ছাড়াও আরও বহু সূক্ষ্ম কণিকা রয়েছে। এরপর বলা হয় কণিকা নয়, তারা তরঙ্গের গুণধর্ম প্রকাশ করে। শেষে আরও অনুসন্ধানের পর বলা হয়, এই ধরনের উপাদানগুলি কণিকা এবং তরঙ্গ দুই ধরনের আচরণই করে থাকে। হাইজেনবার্গ পরে বলেন যে এই ধরনের উপাদানগুলি আদতে কণা না তরঙ্গ তা সঠিক করে বলা যায় না। বাস্তবে তারা কখনও কণা কখনও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকে। এটি হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চিয়তা' তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই একই কথা ঈশোপনিষদেও বলা আছে। এই বোধ থেকেই ভারতীয় একাত্ম দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে পারা যাবে। এই ভাবেই সঙ্ঘের আসল স্বরূপকে বোঝা সম্ভব।'

এই ভাবেই সঙ্ঘ সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন এবং রাজনীতি সমাজেরই একটি অংশ হওয়ার কারণে রাজনীতিতেও স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় হয়ে থাকেন। নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব। তাই তাতে অধিকাধিক মানুষ তাদের মতদান করুন— এই বিষয়কে নিশ্চিত করাও স্বয়ংসেবকের কাজ। সচেতন নাগরিক হিসেবে স্থানীয় এবং ছোটোখাটো বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ বিচার করে রাষ্ট্রের হিতে মানুষের মতদানকে নিশ্চিত করার মতো মহৎ কাজও তারা করবেন। সঙ্ঘের সংবিধানে স্বয়ংসেবকদের (সঙ্ঘের পদাধিকারী ব্যতীত) যে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচারে কখনওই নিষেধাজ্ঞা নেই। তবুও ৯০ শতাংশ স্বয়ংসেবক কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই জনজাগরণ করে থাকেন। সঙ্ঘ কখনই একটি রাজনৈতিক দল নয় বা কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ নয়। এটি সম্পূর্ণ সমাজের একটি সংগঠন। এই বিষয়টি ভারতীয় চিন্তনের একাত্ম দৃষ্টি আর ঈশোপনিষদের দৃষ্টি থেকে বোঝা সম্ভব।

(লেখক সহ-সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)

বারাসাত লোকসভার প্রার্থী
ডাঃ মৃণাল কান্তি দেবনাথ কে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।
এই চিহ্নে ভোট দিন
Vote
for BJP
अब की बार मोदी सरकार
'सबका साथ, सबका विकास'

সোনার বাংলা গড়তে
বিজেপিকে ভোট দিন
শ্রী রাহুল সিনহাকে
কোলকাতা উত্তর কেন্দ্র থেকে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন
বাংলার দরকার
বিজেপি সরকার
Shri Rahul Sinha
Kolkata (Uttar) Lok Sabha Seat

VOTE FOR
BJP
বাংলার প্রকৃত উন্নয়নের দাবীতে
মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী
বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক
শ্যামাপ্রসাদ হালদার কে
এই ছোট চিহ্নে দিন
এই বার দরকার , বিজেপির সরকার

গৌতম বুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কেউ কেউ শুধুই নিজের জন্য জীবনযাপন করেন। দেশ ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব-মানবের কল্যাণকে জীবনের ব্রত মনে করেন। এমনই এক বিশ্বকল্যাণকামী মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই ভারতে। তিনি গৌতমবুদ্ধ। রাজপুত্র তিনি। নাম তখন সিদ্ধার্থ। রাজকীয় জীবন ছেড়ে যৌবনের মধ্যগগনে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। সুকঠোর এক তপস্যার মধ্য দিয়ে তিনি বোধি লাভ করেন, হন বুদ্ধদেব। মানুষকে শেখান জরা-ব্যাধিতে ভরা জীবনের পুনরাবর্তনের পথ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ বা চির শান্তি অর্জনের মন্ত্র। প্রবর্তন করেন এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের। তাঁর সেই ধর্মসাধনার পথ শুধুই কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের পথ দেখান তিনি।

বুদ্ধদেব কিন্তু সকলকেই 'নির্বাণ'-এর সাধনায় মগ্ন হতে বলেননি। বলেননি সংসার ছেড়ে শ্রমণ হয়ে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করতে। বরং সংসারে থেকে ধর্মের পথে, অহিংসা ও প্রেমের পথে, সকলকে ভালোবাসার মন্ত্রে উদ্দীপিত করে এক ভেদাভেদহীন শান্তিকামী সমাজ গঠনেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। বস্তুত তাঁর নির্দেশিত ধর্ম মানুষকে শিখিয়েছিল নিরাসক্ত ভাবে সংসারধর্ম পালন করেও জন্মান্তরের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হতে।

গৌতমবুদ্ধ যে সময় আবির্ভূত হন, সেই সময় ভারত ছিল নানা ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভিক্ত। অসংখ্য সেইসব রাজ্যের পরিচিতি ছিল মহাজনপদ হিসেবে। এই ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে ক্রমেই মগধ হয়ে ওঠে শক্তিশালী। খ্রিস্টপূর্ব ৬৪২ অব্দে শিশুনাগ সিংহাসনে বসার পর থেকে ঘটতে থাকে মগধের প্রভাব বৃদ্ধি। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন সেসময় মগধের সিংহাসনে ছিলেন বিম্বিসার। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যবংশের রাজধানী কপিলাবস্তুতে। তুলনায় ছোটো রাজ্য হলেও রাজপুত্র গৌতমবুদ্ধ বা সিদ্ধার্থ ছিলেন কিছুটা আত্মমগ্ন। তাই তাঁর লালন-পালন বা মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে একটু বেশিই নজর দিতেন রাজা শুদ্ধধোন। মা মায়াদেবী মারা যান সিদ্ধার্থর জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই। স্বভাবতই মাতৃহারা সিদ্ধার্থ বড়ো হতে থাকেন অতিরিক্ত আদরের মধ্য দিয়ে।

সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন মধ্যযৌবনে। স্বভাবতই রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আর সে কারণেই বোধি লাভের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন হলেন তথাগত বুদ্ধ

পরম্পরা

তখন সামাজিক বহু কিছুর বিরোধিতা করলেও কখনই সেভাবে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেননি। বরং একজন রাজা কীভাবে তাঁর শাসন পরিচালনা করলে প্রজারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে পারবে সে সম্পর্কে বেশকিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর বোধির আলোকেই বুদ্ধদেব ধর্মসম্মত নৈতিক জীবনযাপনের উচ্চ-আদর্শ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও সৎ ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করার কথা বলেন। সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্রপ্রশাসন ও মানব কল্যাণের জন্য বুদ্ধদেব যেসব কথা বলেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানালোকে ধৌত অন্তরের প্রজ্ঞা এবং বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গিই আভাসিত হয়েছে।

ধর্মসাধনার নতুন পথ এবং সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুসংস্কৃত করার যেসব নির্দেশ তিনি দেন, তা বিধৃত রয়েছে বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে। আর সেসব পাঠ করলে সহজেই পরিচিত হওয়া যায় গৌতমবুদ্ধের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ও বোঝা যায় কেন বুদ্ধদেব সৎ-সুন্দর-শান্তিময় জীবনের জন্য রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছিলেন।

বৌদ্ধ মতবাদের এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য— এটি সম্পূর্ণ ভাবেই একটি মানবিক সনদ। মানুষই ওই সনদের রচয়িতা, মানুষের জন্য বা মানবকল্যাণই ওই সনদের লক্ষ্য। বৌদ্ধদর্শন বা মতবাদের উদ্ভব অতি উন্নত এক মানবচিত্ত থেকে। এটির ব্যবহারও মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। বৌদ্ধ মতবাদ এমন একটি ধর্ম যা সবসময়ই মানুষের আচরণ সম্পর্কে বেশি সচেতন। একজন মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন কীভাবে কাটাবে, কীভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে সে সম্পর্কে মানুষকে পথ দেখায় এই ধর্ম।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন মূলত নির্দেশাত্মক। তবে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

কিছু বলা হয়নি এতে। কিন্তু বুদ্ধদেব চেয়েছেন, একজন রাজা হবেন ধর্ম-পথিক, বিশুদ্ধ ও শক্তিতে ভরপুর।

বুদ্ধের সময় রাজতন্ত্রেরই ছিল প্রাধান্য। রাজাই ছিলেন শাসন ব্যবস্থায় শিরোমণি। বুদ্ধদেব কোনো সময়ই এই অবস্থার অবসান চাননি। শুধু চেয়েছেন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা সব সময়ে প্রজা-কল্যাণে ধর্মের পথে থাকবেন তৎপর। রক্ষা করবেন সকলকে ধর্ম-নির্দেশিত পথেই। বুদ্ধদেব বলেন, অহিংসা এবং সহানুভূতিশীল সার্বভৌমত্বের নীতিতেই রাজা রক্ষা করবেন সকলকে। পরিচালিত করবেন তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ জীবনমার্গে।

বুদ্ধদেব যে ধার্মিক রাজার কথা বলেছেন, তা যে কেবল তাঁর সমকালেই প্রয়োজ্য তা নয়। বরং দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে তা এক বিশ্বজনীন আদর্শে পরিণত। বুদ্ধদেব যে ধর্মজ্ঞ রাজার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তা গড়ে উঠেছে মূলত পাঁচটি মহাকাব্য বা নীতির ভিত্তিতে।

তথাগত নির্দেশিত ওই পঞ্চনীতি হলো— সবরকম প্রাণীর প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকা, অস্তেয় অর্থাৎ যা তাঁকে দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ না করা, পরস্ত্রী থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা বর্জন ও সত্যের পথে স্থির থাকা এবং সবরকম মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা।

বুদ্ধদেব নির্দেশিত এই পঞ্চনীতির সারকথা হলো নিজের স্বার্থেই রাজা হবেন ধর্মজ্ঞ, অহিংস ও চরিত্রবান। তিনি যদি নীতিভ্রষ্ট হন তাহলে প্রজারাও হবে বিপথগামী। প্রাধান্য পাবে উচ্ছৃঙ্খলতা। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠবে রাজার পক্ষেই বিপজ্জনক। এমনকী তাতে বিপন্ন হতে পারে তাঁর অস্তিত্বও। আর একারণেই রাজাকে সবসময়ই হয়ে উঠতে হবে প্রজাদের আদর্শ। তাতেই বজায় থাকবে শান্তি। রাজা ও রাজত্বও থাকবে নিরাপদ।

সরাসরি রাজতন্ত্রের বিরোধিতা না করলেও অন্তরের দিক থেকে বুদ্ধদেব ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারি। সে কারণেই তিনি তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। বরং পুরো ব্যাপারটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন ভিক্ষু সঙ্ঘের ওপরে। তাঁরাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত করেন পরবর্তী সঙ্ঘ-প্রধানকে। এবং সেই ধারাই অনুসৃত হয়ে আসছে আজও।

একনায়কতন্ত্রের বিরোধী বুদ্ধদেব সমসময়ই ছিলেন পারস্পরিক আলোচনা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী। কোনো গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার পড়লে সেটি তুলে ধরতেন ভিক্ষু ও শ্রমণদের সামনে। জানতে চাইতেন প্রত্যেকের মতামত। অনেকটা সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলেই সঙ্ঘসদস্যরা আলাপ-আলোচনা- বিতর্কের মধ্য দিয়ে জানাতেন নিজেদের মতামত। তারপর তারই ভিত্তিতে নেওয়া হতো শেষ সিদ্ধান্ত।

রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ছিল একটা স্পষ্ট ধারণা। সেই মতবাদ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাও ছিল তাঁর। কিন্তু কোনো সময়েই নতুন কোনো রাজনৈতিক দর্শন বা মতবাদ সৃষ্টি বা প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না তিনি।

বুদ্ধদেবের মতে, এই পৃথিবী কেন, স্বর্গেও পরমসুখ বলে কিছু নেই। সে সুখ এবং শান্তি মেলে একমাত্র নির্বাণে। কিন্তু সকলেই যদি নির্বাণ লাভের সাধনায় ব্রতী হন তাহলে তো সংসার বলে কিছু থাকবে না। এমনকী বন্ধ হয়ে যেতে পারে সৃজন-প্রক্রিয়াও। তাই গার্হস্থ্য জীবনকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। তবে সে জীবন হোক সবরকম ভেদাভেদহীন এক সাম্য ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। হিংসার যেন কোনো স্থান না থাকে সেই জীবনে,— এমনটাই বলেছেন তিনি। সৎ, সুন্দর, ধর্মনিষ্ঠ, প্রেম-মৈত্রীর আবহে মানুষ যাতে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে সেই উপদেশই দিয়েছেন তিনি। সমাজ রক্ষায়, সামাজিক মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য রাজা বা শাসকরা এই নীতি মেনে চলুন এটাই ছিল তাঁর বাসনা এবং নির্দেশও।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেই বুদ্ধদেব বলেছিলেন মানুষের সমানাধিকার এবং সমমর্যাদার কথা। একইসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা বোধের উন্মেষ ঘটাতে। সমাজের সব কাজে সকলে সমানভাবে যুক্ত হোক, এটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম ও বিনয় অর্থাৎ নীতির অনুশাসন মেনে চলুক সকলে এটাই তিনি বলেছেন বারবার।

তবে শুধু মুখেই অহিংসা আর শান্তির কথা বলেননি বুদ্ধদেব, সেই বার্তাকে বাস্তবরূপ দিতেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেছে তাঁকে। ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত প্রথম ও একমাত্র ধর্মগুরু যিনি সমরক্ষেত্রে গিয়ে রোধ করেন যুদ্ধ। বিবদমান দু' পক্ষকেই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাতে রাজিও করান। তঁারই প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে রোহিণী নদীর জল নিয়ে যুদ্ধে মুখোমুখি শাক্য এবং কোলিওরা নিরস্ত হয় সংগ্রাম থেকে। একই ভাবে অজাতশত্রুকেও তিনি বিরত করেন বিজ্জিসাম্রাজ্য আক্রমণ করা থেকে।

বুদ্ধদেব বরাবরই গুরুত্ব দিতেন সৎ-শাসনকে। 'অঙ্গুত্রনিকয়'-এ তিনি বলেন, রাজা সৎ হলে মন্ত্রীরাও সৎ হতে বাধ্য। মন্ত্রীদের মতোই অন্যান্য রাজকর্মচারীরাও তখন চলেন সততার পথে। আর সেটা হলে সাধারণ কর্মীরাও হন সৎ এবং পরিণতিতে প্রজারাও হন সৎ এবং ন্যায়বান।

চক্কবাত্তি সিহনন্দ সূত্তে বুদ্ধদেব কঠোর ভাবে দুর্নীতি ও অপরাধ দমনের কথা বলেছেন। বলেছেন, রাজা যদি শুধু শক্তি প্রয়োগ করে অপরাধ দমন করতে যান, তাহলে কিন্তু তিনি ব্যর্থ হবেন। বরং অর্থনীতির উন্নতি ঘটাতে পারলেই কমবে অপরাধ।

একই ভাবে, জাতকে 'দশরাজা ধর্ম্ম' আখ্যানে তিনি সুশাসনের জন্য দশটি নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। উদারতা ও স্বার্থত্যাগ, উচ্চনৈতিক চরিত্র, প্রজাদের সুখের জন্য আত্মত্যাগ, সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সবরকম ঘৃণা থেকে দূরে থাকা, অহিংসার অনুসরণ, জনমতকে মর্যাদাদান এবং ধৈর্য,--- এই দশগুণই একজনকে প্রকৃত সুশাসক করে তোলে, এমন কথাই বলেন তিনি।

শুধু ধর্মপ্রচার নয়, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজধর্ম বা কর্তব্য সম্পর্কেও যেসব কথা বলেছেন তিনি, তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই একই ভাবে প্রযোজ্য। এই বিশ্বজনীন সহমর্মিতার কারণেও বুদ্ধদেব আজও বরণীয়। স্মরণীয়ও। ∎

বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ভগবান তথাগত বুদ্ধ জাগতিক রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় জানার জন্য সংসার ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ অবস্থায় দীর্ঘকাল সমাধিমগ্ন থাকেন। তারপর তাঁর বোধ বা প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটে। বুদ্ধের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় চারটি চরম সত্য, যা বৌদ্ধ দর্শনে 'চত্বারি আর্যসত্যানি' নামে প্রসিদ্ধ। এই আর্যসত্য চতুষ্টয় হলো— দুঃখ, দুঃখ-সমুদায়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধ-মার্গ। অর্থাৎ দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখ থেকে নিবৃত্তিলাভের উপায়ও আছে।

বৌদ্ধদর্শন সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছাবার জন্য সহজ-সরল কিছু নীতিগল্প আছে। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে-পরের কিছু ঘটনা মানব সংস্কারকার্যে তথাগতের আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বার্তা দেয়। মানুষের পূর্বজন্ম এবং পরজন্মের কার্যকারণতত্ত্ব মানুষকে সুপথে চলতে সাহায্য করে।

বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি নানা দেশে বাণিজ্য করতে করতে শ্রাবস্তী নগরে এসে বাণিজ্য করে প্রচুর ধনলাভ করতে সমর্থ হন। ধনবান হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি নিজে কিছুই ভোগ করতেন না। সামান্য স্থূলবস্ত্র অঙ্গে দিতেন, সারাদিনে সামান্য আহার গ্রহণ করতেন এবং কোনও ভাবেই তিনি দান-ধ্যান-ধর্মালোচনা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতেন না। উপার্জিত অর্থের কোনও অংশ নিজে ভোগ না করে শুধুই সঞ্চয় করতেন। এবং এইভাবে চলতে চলতেই একদিন তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি রাজসম্পত্তি বলে পরিগণিত হলো। রাজা তথাগতকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি জানালেন— 'হে রাজন! নিজের কর্মফলের জন্যই সেই ব্যক্তির মন ধনলাভে বিরত হয়েছিল। ধনের মধ্যে বসে থেকেও সে ভোগ করতে পারেনি।' রাজাকে তাঁর প্রশ্নের কার্যকারণ উত্তর বিশ্লেষণ করতে করতে তথাগত আরও একটি পূর্বজন্মের কাহিনি উপমা স্বরূপ বর্ণনা করলেন— ''পুরাকালে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশী নামক স্থানে এক নিঃসন্তান ব্যবসায়ী বাস করতেন। সেই ব্যক্তি কোনও ভাবেই জীবনে চলার পথে জীবনযাপন- ধর্ম পালন করেননি। অত্যন্ত কৃপণভাবে তিনি তার দিনযাপন করতেন। তিনি নিজে যেমন কিছু খেতেন না, অন্যের খাওয়াও তেমন সহ্য করতে পারতেন না। একদিন ওই ব্যক্তি তগরশিখি নামে বিখ্যাত এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাচর্যায় রত থাকতে দেখলেন। ওই ব্যক্তি তগরশিখিকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন, নিজের গৃহে নিজের পালঙ্কে উপবেশন করিয়ে গৃহিণীকে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিতে বললেন। স্বামীর আদেশে গৃহিণী ভক্তিভাবে ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিলেন। ভিক্ষালাভ করে তগরশিখি তাঁর বিহারে যাবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। ওই ব্যক্তি তগরশিখিকে প্রণাম করে বিদায় জানালেন। কিন্তু বিদায়রত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র দেখার পর থেকে ওই ব্যক্তির মনে অশান্তি শুরু হলো। তিনি খাদ্য অপচয়ের কথা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন ওই খাদ্য অন্যকে দিলে বিনিময়ে কিছু শ্রম আদায় করতে পারতেন। ওই ব্যক্তির অমন চিন্তা তার দানকে কলুষিত করল। কারণ সঠিক দানের তিনটি শর্ত থাকে— দাতা সবসময় হরষিত মনে দান করবে, দানে কোনো অনুতাপ থাকবে না, দানের পর মন প্রভূত আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। তথাগত জানালেন যেহেতু ওই ব্যক্তির মনে তগরশিখিকে দান করার ইচ্ছা জেগেছিল তাই সে পরজন্মে ধনী হলো। যেহেতু ওই ব্যক্তির দানক্রিয়া সঠিক হয়নি তাই পরজন্মে তার ধন কোনওভাবেই নিজস্ব ভোগে লাগল না। পূর্বজন্মে সে ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছিল বলে এজন্মে ওই ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থাতেই থেকে গেল। এই সমস্ত মানুষ সারা জীবন 'আমার-আমার', 'আমার ধন আমার ধন' করে শুধু কেঁদে মরে। যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবায় তারা রত থাকে না এবং সবকিছু 'আমার', 'আমার', 'আমার ধন', 'আমার ধন' বলে সর্বদা চিৎকারেই ব্যস্ত থাকে, সেহেতু কখনও ভোগ করতে পারে না।''

জীবনের সমস্তরকমের দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভের জন্য বৌদ্ধদর্শনে আটটি উপায় নির্দিষ্ট করা আছে— সম্যগ্‌দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যগ্‌বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই আটটি উপায় বৌদ্ধদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত।

গৌতমবুদ্ধের উপদেশাবলীর ভিত্তিতে উদ্ভূত দর্শন মতে কোনও বস্তুই স্বয়ম্ভূ নয়, সমস্ত বস্তুই পূর্ব অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। ওই মতবাদই হলো 'প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব'। এই দর্শনের 'অনিত্যতাবাদ' নামে প্রসিদ্ধ এক মতবাদ জানাচ্ছে— সমস্ত বস্তুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধদর্শনের 'ক্ষণিকত্ববাদ' নামের মতবাদ ব্যক্ত করছে— সতত পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের অবিরাম প্রবাহ চলতে থাকে। বুদ্ধদেব স্বীকার করেছেন নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জন্মান্তরকে রোধ করে নির্বাণলাভ সম্ভব। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

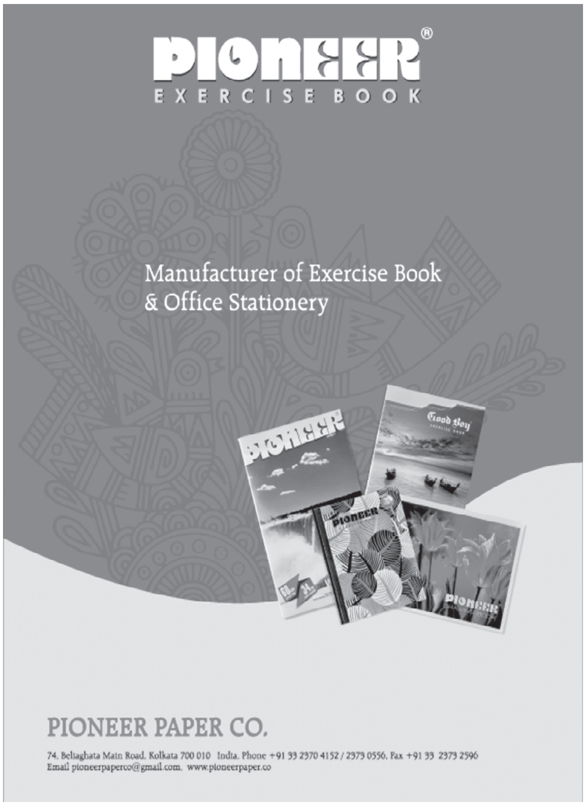

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সোশ্যাল মিডিয়ার চাপে সোনির ডিগবাজি

চন্দ্রভানু ঘোষাল

স্বস্তিকার পাঠকদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনাদের মধ্যে কেউ সোনি রাজদান বলে কারও নাম শুনেছেন? খুব বেশি হাত ওঠার কথা নয়। কারণ সোনি এক সময়ে হিন্দি সিরিয়ালে (এবং গুটিকয়েক ছবিতে) অভিনয় করলেও বড়ো অভিনেত্রী কোনওকালেই ছিলেন না। আবার যাদের নামে একশো-দু'শো কোটি টাকার সার্কিট বিক্রি হয়, সেরকম বড়ো স্টারও ছিলেন না। সোনি বলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মহেশ ভাটের স্ত্রী, আলিয়া ভাটের মা এবং অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী একজন মহিলা।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে সোনি রাজদানকে নিয়ে ফিচার লেখার দরকার হয়ে পড়ল কেন? কারণ সম্প্রতি নবভারত টাইমস পত্রিকায় তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি কিছুটা উপযাচক হয়েই তাঁর পাকিস্তান-প্রীতির কথা স্বীকার করেছেন। উপযাচক শব্দটা ব্যবহার করতে হলো কারণ সাক্ষাৎকার যিনি নিচ্ছিলেন তিনি পাকিস্তান নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি। এতৎসত্ত্বেও, তিনি বলেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় পাকিস্তানে চলে যাই। ওখানে গেলে আমি এখানকার থেকে ভালো থাকব।' না, এখানেই থামেননি অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'এসব কথা যখন আমি বলি তখন কিছু লোক আমায় দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে পাকিস্তানে চলে যেতে বলে। আমিও ভাবি, আমার বোধহয় পাকিস্তানে চলে যাওয়াই উচিত। ওখানকার খাবার দারুণ। ওখানে থাকলে আমি বেশ ভালো থাকব।' সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হবার পর স্বাভাবিক ভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গেছে। নেটিজেনদের বক্তব্য, সোনির যদি মনে হয় পাকিস্তানে থাকলে ভালো থাকবেন তা হলে বরং পাকিস্তানেই চলে যান। লাগাতার আক্রমণে কোণঠাসা সোনি বলতে বাধ্য হন, তিনি পাকাপাকি ভাবে পাকিস্তানে যাবার কথা বলেননি। বেড়াতে যাবার কথা বলেছেন।

সোনি রাজদান যে কারণেই পাকিস্তানে যাওয়ার কথা বলুন, পাকিস্তান যে তার অত্যন্ত ভালোলাগার দেশ সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ করা চলে না। এর আগেও তিনি তাঁর পাকিস্তানপ্রীতির কথা বলেছেন। শুধু তিনিই নন বলিউডের বহু তারকা, যারা উপাসনা পদ্ধতির নিরিখে মুসলমান, প্রায়শই পাকিস্তানের প্রশংসা করে থাকেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন? কারণ এদেশের মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ পাকিস্তানের ভক্ত। অন্ধ ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বলা বাহুল্য, চিত্রতারকারাও তার ব্যতিক্রম নন। ভারত তাদের অর্থ দেবে, মর্যাদা দেবে, তারকা হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি দেবে কিন্তু তারা গুণ গাইবেন পাকিস্তানের। শাহরুখ খান, সলমন খান, আমির খান, সইফ আলি খান, শাবানা আজমি, জাভেদ আখতার— সবাই এই গোত্রের। কিছুদিন আগে আমির বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী এ দেশে থাকতে আজকাল ভয় পান। হয়তো একদিন এ দেশ ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে।' নাসিরুদ্দিন শাহের মুখেও আমরা একই ধরনের কথা শুনেছি। পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানেরা জঙ্গিদের হাতে খুন হবার পর বলিউড যখন পাকিস্তানের অভিনেতা-কলাকুশলীদের ব্যান করল তখন তার প্রতিবাদ করেছিলেন সলমন খান। কারণ পাকিস্তানের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব থেকে বেশি সুযোগ পান সলমনের ছবিতেই। এদের পাকিস্তান প্রীতির প্রেক্ষাপটে রয়েছে পাকিস্তানের বাজার। এদের সকলের ছবিই একযোগে ভারত-পাকিস্তানে মুক্তি পায়। তাই, পাকিস্তান ভারতের যত বড়ো ক্ষতিই করুক না কেন, পাকিস্তানের বাজারের লোভ ত্যাগ করতে এরা নারাজ। ভারতে এদের ছবির বাজার যত সঙ্কুচিত হচ্ছে ততই বাড়ছে ইসলামিক দেশগুলির, বিশেষ করে পাকিস্তানের বাজারের প্রতি আগ্রহ। কারণ ভারতীয়ত্বের পরিচয় মুছে ফেলে নিজেদের মুসলমান পরিচয় ভাঙিয়ে পাকিস্তানে দিব্যি করে খাওয়া যায়।

সোনি রাজদান পাসপোর্ট-সূত্রে ভারতীয়, অন্তরের টানে নন। সুতরাং দেশের প্রতি তার আবেগ না থাকা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাকিস্তানের গুণ গাইবার পর ইতিমধ্যেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন। তাদের যুক্তি, শিল্পের কোনও দেশ হয় না। কথাটা ঠিক। আবার ভুলও। শিল্পের দেশ হয় না কিন্তু শিল্পীর হয়। ভারতীয়ত্ব বাদ দিয়ে কি আমরা সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনকে ভাবতে পারি? নাকি বিশ শতকের আমেরিকাকে বাদ দিয়ে চ্যাপলিনকে ভাবা যায়? শিল্পী থাকলে তার দেশও থাকবে। শিল্পীর শিল্পভাবনায় এবং প্রকরণে থাকবে তার দেশজ উপাদানও। নয়তো তার শিল্প সুকুমার রায়ের ভাষায় বকচ্ছপ (বক + কচ্ছপ) হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সোনি রাজদানরা এই সহজ কথাটা মানেন না। কারণ তারা আগে মানুষ নন, মুসলমান। তারা যে দেশের নাগরিক হোন, দেশটি যদি ইসলামিক দেশ না হয়, তাহলে তারা আরবের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঠিক যেমন ভারতের নাগরিক হলে মুসলমানরা দিনরাত পাকিস্তানের কথা ভাবেন। ■

ইসলামিক স্টেটের হুমকি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অশনি সংকেত

দেবযানী ভট্টাচার্য

গত ২৭ এপ্রিল দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এক ভয়ংকর খবর। বিশিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা মারফত জানা গিয়েছে যে, ইসলামিক স্টেট নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে বাঙ্গলায় লেখা একটি পোস্টার। পোস্টারে লেখা, 'শীঘ্র আসছি, ইনশাআল্লাহ' এবং তাতে রয়েছে আল্-মুর্সালাত নামক একটি সংস্থার লোগো। এহেন পোস্টার দেখে গোয়েন্দা সংস্থার সন্দেহ যে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে হয়তো বা কোনো হামলার পরিকল্পনা করছে আইসিস।

বাংলাদেশের সীমান্ত-সংলগ্ন যে রাজ্যে ইসলামি জেহাদ এতখানি বিস্তার লাভ করেছে প্রথমে বামপন্থী, তারপর অতিবামপন্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, সে রাজ্যে যে আইসিসের মতো ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন পদার্পণ করতে পারে, তাতে আশ্চর্য কী!

তবে 'শীঘ্রই আসছি, ইনশাআল্লাহ' পোস্টারটি কোনো হামলার পূর্বাভাস না-ও হতে পারে। বরং এ হয়তো এ রাজ্যে আইসিসের প্রবেশের সদর্প ঘোষণা। বাংলাদেশে আইসিসের জোরালো উপস্থিতি ইতিমধ্যেই রয়েছে। জামাত-উল-মুজাহিদিন নামক বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনটি কেন্দ্রীয় আইসিসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তার পরেও এ হেন বাংলা পোস্টার সার্কুলেট করার মাধ্যমে তারা হয়তো জানাতে চাইছে যে শীঘ্রই তাদের কর্মক্ষেত্র তারা সরাসরি বিস্তার করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গেও।

কিন্তু শুধুমাত্র এই অনুমানের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার উপায় নেই গোয়েন্দা দপ্তরের, কারণ শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের পিছনে ছিল আইসিসেরই হাত। তাছাড়া গত ৩০ এপ্রিল কেরল থেকেও এনআইএ-র হাতে ধরা পড়েছে এক আইসিস জঙ্গি যার পরিকল্পনা ছিল শ্রীলঙ্কার কায়দায় এদেশেও জঙ্গি বিস্ফোরণ ঘটানোর। বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইসিসের সরাসরি, সুপ্রতিষ্ঠিত সংযোগ এবং তারপর এহেন বাংলা পোস্টার যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এমন সম্ভাবনার সন্দেহ উস্কে দিচ্ছে যে এই পোস্টারের মাধ্যমে হয়তো পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে কোনো হামলার পরিকল্পনার আভাস দিচ্ছে আইসিস। ফলে গোয়েন্দা দপ্তর স্বাভাবিকভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করছে।

সংগঠনে নতুন জঙ্গি নিয়োগ এবং এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জামাত-উল-

রাজ্য রাজনীতি

মুজাহিদিনের প্রতিনিধিদের নিয়মিত যাতায়াত আছে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায়। এ বিষয়ে ওপেন সিক্রেটটি হলো, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের উপর জামাত-নেতাদের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোট একত্রে নিজের ঝুলিতে পোরার জন্য এই জঙ্গি সংগঠনটিকে যে যথেষ্ট সহযোগিতা ও তোষণ করেন মমতা, এমন অভিযোগ তাঁর দলের অন্দরেই। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে ঘনঘন ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই জামাত নেতাদের সঙ্গে মমতার অতিরিক্ত যোগাযোগ দলের অ-মুসলমান নেতারাও ভালোভাবে মেনে নিতে পারছেন না। জামাত ও আইসিস জঙ্গিদের যে এ রাজ্যে অবাধ গতি, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত আরিফুল ইসলাম নামক এক জামাতি জঙ্গি এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই ধরা পড়েছে কলকাতার বাবুঘাটে। আবার গত বছর জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে বর্ধমান স্টেশনে এক ট্রেনের কামরা থেকে গ্রেপ্তার হয় মসিরুদ্দিন ওরফে মুসা নামক এক জামাত-আইসিস জঙ্গি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমেরিকান এফবিআই। মুসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছিল যে ২০১৪ সালে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর গ্রেপ্তার হওয়া জামাতি জঙ্গি আমজাদ শেখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মুসার। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, বছর তিনেক আগে, ২০১৬ সালে জামাতের স্লিপার সেল তাদের জঙ্গি কার্যকলাপে কর্মী নিয়োগ করতে চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

এই সমস্ত তথ্য একটিমাত্র দিকনির্দেশ করে তা হলো, সেকুলারিজমের নামে বামপন্থীদের মুসলমান তোষণ, অনুপ্রবেশে মদত জোগানো এবং তৎপরবর্তীকালে ক্ষমতা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি জঙ্গি-ঘনিষ্ঠতা পশ্চিমবঙ্গকে করে তুলেছে এক বারুদের স্তূপ। এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে ড্রাগের রমরমাও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। জিহাদে দীক্ষা দেওয়ার অন্যতম প্রাথমিক প্রি-ট্রিটমেন্ট হলো ড্রাগ। কারণ জেহাদের দীক্ষা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই মগজ ধোলাইয়ের আগে ড্রাগের প্রয়োগের দ্বারা তাদের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে শুরু হয় ধ্বংসকার্যের দীক্ষা। ড্রাগের রমরমা, তারপর আইসিসের বাংলা পোস্টার, এহেন ঘটনাক্রম থেকে অনুমান করা যেতেই পারে যে পশ্চিমবঙ্গেও হয়তো জিহাদের প্রসার শুরু হতে চলেছে জোরদারভাবে, ঠিক কেরলের কায়দায়। কমিউনিস্ট শাসিত কেরল থেকে প্রতি বছর বহু মানুষ উধাও হয় আইসিসে যোগ দেওয়ার জন্য।

আর একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরবান নকশালরা আইসিসের বিষয়ে বানিয়েছে একটা অদ্ভুত গল্প। ওরা বলে যে

আইসিস নাকি আদতে কোনো ইসলামিক সংগঠন নয়, বরং আমেরিকা আর ইজরায়েলের যৌথ ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট একটি সংস্থা, যার উদ্দেশ্য ইসলামকে বদনাম করা এবং নিজেদের অস্ত্র ব্যবসা জারি রাখা। অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে বিষয়টাকে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে লিঙ্ক করে দেয় বলে কমিউনিস্টদের এই অপপ্রচার অনেকের মনে হয়তো কিছুটা ক্ষীণ বিশ্বাসও উৎপাদন করে। কমিউনিস্টদের এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হয়তো আইসিসকে এবং তার প্রসারকে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়ে বিশ্বজুড়ে এক চরম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা। কারণ, কমিউনিজমের প্রসারের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা আবশ্যক।

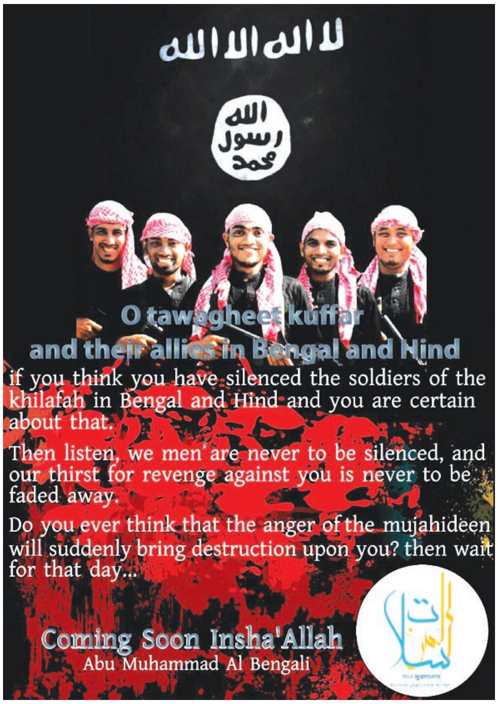

কিন্তু বাস্তব হলো, আইসিস এমন একটি রাডিক্যাল ইসলামিক গ্রুপ যারা জোর করে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে ইসলাম আসার আগে, পৃথিবীতে কিছু ছিল না। পৃথিবীর সবকিছু শুরু হয়েছে ইসলামের থেকে। যে কারণে তারা প্রথমত প্রি-ইসলামিক পিরিয়ডের সমস্ত নিদর্শনকে ধ্বংস করতে চায় এবং সেইসব ধ্বংসকার্য সমাপ্ত হলে সমগ্র পৃথিবীতে তারা কায়েম করতে চায় শুধুমাত্র ইসলামের শাসন। গোটা পৃথিবীতে এই অযৌক্তিক মনোকালচার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধ্বংসাত্মক এই জেহাদি পদ্ধতি ছাড়া উপায় নেই। কারণ এমন নির্বিচার ধ্বংসকাণ্ড কোনো সুস্থ, যৌক্তিক চিন্তার ফসল হতে পারে না। তাই এই অযৌক্তিক জেহাদপন্থা। এ বিষয়ে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা হলো, জেহাদ প্রসারের উদ্দেশ্যে তারা ছেলে-মেয়েদের জন্য ভালো টাকাপয়সা এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে থাকে যা তরুণ প্রজন্মকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম।

এহেন উগ্রপন্থার কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গের নবপ্রজন্মকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের সমাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব কম নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত অবশ্যকর্তব্য হলো পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষাকে নিশ্ছিদ্র ও অত্যাধুনিক করে তোলা যাতে ইসলামিক বাংলাদেশ থেকে অবারিত জঙ্গি-অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়। এ বিষয়ে একটি গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য মশারি খাটিয়ে শুতেন। কিন্তু মশারিতে যাতে হাওয়া ঢুকতে পারে, সেইজন্য মশারির একটা দিক তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ খোলা রাখতেন। অর্থাৎ মশারির তিন দিক আটকানো, একদিন পুরো খোলা! বৃদ্ধের এই অসামান্য কর্মকাণ্ডের ফলে মশারিতে হাওয়া খুবই ঢুকতো, কিন্তু মশাদেরও ঠেকানো যেত না। তারা এটা বিবেচনা করত না যে এদিকটা তাদের জন্য নয়, খোলা রাখা হয়েছে হাওয়া ঢোকার জন্য। মশাদের নৈতিকতা বোধ বলে কিছু নেই!

অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষেরও পশ্চিম সীমান্তে আঁটোসাঁটো সুরক্ষা, আর পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় পুরোপুরিই খোলা। ঠিক যেন সেই বৃদ্ধের মশারি। খোলা পূর্ব সীমান্ত দিয়ে অনবরত ঢুকছে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী— সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীও। তাই পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে সিল করার দাবি ওঠা উচিত। আর যে অঞ্চলে বর্ডার সিল করা ভৌগোলিকভাবে অসম্ভব, যেমন নদী-সীমান্ত, সেখানে অত্যাধুনিক সীমান্ত সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা অবশ্য প্রয়োজন। আমাদের দেশের পূর্ব সীমান্তের ভৌগোলিক প্রকৃতি যেহেতু পশ্চিম সীমান্তের ভৌগোলিক প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষাবিধিও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আলাদা হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব সীমান্তটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত সমতলভূমি অধ্যুষিত ও ঘনবসতিপূর্ণ। সেখান দিয়ে প্রবেশ করে স্বগোষ্ঠীর ভিড়ে মিশে যেতে একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর কয়েক মিনিট মাত্র লাগে।

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের যথোপযুক্ত সুরক্ষার দাবিটি জোরদারভাবে তোলা আমাদের পরম কর্তব্য। সেই সঙ্গে আছে সামাজিক কর্তব্য। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান বাড়ির ছেমেয়েদের তথ্য দিয়ে বুঝাতে শেখাতে হবে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে। ড্রাগের নেশায় আসক্তি আটকাতে যেখানে সেখানে খাবার খাওয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করার শিক্ষা তাদের দেওয়া প্রয়োজন। তাদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন পয়সাকড়ির জন্য প্রবল লালায়িত না হওয়ার এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নজর রাখতে হবে তাদের বন্ধুবান্ধব ও গতিবিধির উপর। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতে হবে যাতে তাদের গল্পগুলো তারা অভিভাবক- স্থানীয় গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করতে দ্বিধা না করে। তাদের পাশে থাকতে হবে বন্ধুর মতো, যাতে চরম বিপদের হাত থেকে তাদের বাঁচানো যায়।

জঙ্গি ইসলামের থাবা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। হিন্দু বাঙ্গালিকে হতে হবে সম্মিলিত, ঐক্যবদ্ধ। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, চরম বিপদের মুখে আত্মরক্ষা পরম ধর্ম। ■

অমরকোটের রূপকথা

প্রবাল চক্রবর্তী

একটা গল্প বলি, শুনুন। ছোট্ট গল্প, রূপকথার গল্প।

এক যে ছিল রাজা। নাম? রাণা অমরসিংহ সোধা। ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিমে, থর মরুভূমি যেখানে আলতো করে ছুঁয়েছে মকরের ঊষর উপকূলকে, সেখানেই ছিল তাঁর রাজপাট। রাজ্যের নাম অমরকোট। প্রজাদের প্রায় সকলেই হিন্দু, কয়েকঘর মুসলমান প্রজাও রয়েছে। রাজপুত বংশীয় এই রাজার পূর্বপুরুষরা যুগ যুগ ধরে ভারতের প্রবেশদ্বার আগলেছেন বিদেশি আক্রমণকারীদের হাত থেকে, বংশ পরম্পরায়। অন্য রাজপুত রাজাদের মতোই।

সময়টা চল্লিশের দশক। হাজার বছর প্রতীক্ষার পর ভারত স্বাধীন হয়েছে, মায়ের অঙ্গবিচ্ছেদ করে শত্রুদেশ পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। সে সময় ভারতখণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল তিনশোর বেশি স্বাধীন রাজ্য। মকর থেকে গুজরাট, থর মরুভূমির প্রায় সবটাই ছিল মূলত এই স্বতন্ত্র রাজাদের হাতে। পাকিস্তানের নব্য-বাদশা জিন্নার নজর পড়ল এই অঞ্চলে। এখানে মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান ছিল জিন্নার কাছে বস্তুত একটি বীচহেড, যেখানে পা রেখে সম্পূর্ণ ভারতকে দখল করা যায়। আর ভারত পুনর্দখল করতে গেলে থর মরুভূমির দখল তো চাইই চাই।

রাণা অমরসিংহ মানুষ কেমন ছিলেন? একদিকে পরম্পরানিষ্ঠ, দানধ্যান পূজার্চনায় খামতি ছিল না তাঁর। অন্যদিকে ছিলেন তিনি আত্মম্ভরি, সিংহাসনের মোহে আবিষ্ট, নিজের বুদ্ধির ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। সেটা জিন্নার ভালোই জানা ছিল। জিন্না গিয়ে ধরল রাণাকে। বলল— কী ভাবছেন, ভারতে যোগ দেবেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিন্তু আগমার্কা সোশ্যালিস্ট। ভারতভুক্তির পরই রাজন্যপ্রথার বিলোপ ঘটাবে, শুনেছি এমনটাই ঠিক করেছে। ভারতে যোগ দিলে সিংহাসন খোয়াতে হবে শিগগিরই। সেটাই কি চান? নেহরুর অধীনে জীবন কাটাতে পারবেন?

রাণা বললেন, নেহরুর তাঁবে থাকার চেয়ে মরণ ভালো! কিন্তু পাকিস্তানেই বা যোগ দিই কী করে? আমার অধিকাংশ প্রজাই তো হিন্দু। আর আপনাদের তো ইসলামিক দেশ!

জিন্না বলল, আমার পাকিস্তানে সব ধর্মের সমানাধিকার থাকবে। এককালে মুঘল রাজত্বের সঙ্গে সহাবস্থান করেছিলেন আপনার পূর্বপুরুষ, ঠিক কিনা? মনে করুন, আবার সেরকমই হচ্ছে। সুফিবাদের জন্মই তো আপনার রাজ্য, সহাবস্থানের স্বর্গ আপনার রাজত্ব কি শুধুমাত্র মুসলমান বলে আমাকে বিমুখ করবে? তাছাড়া ভেবে দেখুন, জাতে আপনারা রাজপুত হলেও আপনার রাজ্যের যাবতীয় ব্যবসা- বাণিজ্য হয় করাচি বন্দরের মধ্যে দিয়ে, সিন্ধুপ্রদেশের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। করাচি শুদ্ধু সেই সিন্ধু তো পাকিস্তানে গেছে, তাহলে আপনি বাইরে পড়ে থাকবেন কেন? ভবিষ্যৎ সিন্ধের নেতৃত্ব তো আপনাকেই দিতে হবে। করাচির দখলও পাবেন আপনি। আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে আছে? এইসব বলে কয়ে রাণাকে পাকিস্তানে যোগ দিতে রাজি করিয়ে ফেলল জিন্না। অমরকোটের প্রজারাও রাণার প্রতি অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিলো পাকিস্তানভুক্তি। সিন্ধি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রোপাগান্ডা সেই কাজটাকে করে দিল আরও সরল।

অমরকোটের দখল নিশ্চিত করে জিন্না লেগে পড়ল বাকি থর মরুভূমি দখল করতে। অগাধ টাকাপয়সা ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কুনকি হাতির ভূমিকায় কাজে লাগালো রাণা অমরসিংহকে,

রাজস্থান-গুজরাটের বাকি রাজাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাকিস্তানভুক্ত করতে।

নেহরুর প্রতি বিদ্বেষ তো ছিলই। নেহরু যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেই ভারতের প্রতিও বিদ্বেষ। তার সঙ্গে যুক্ত হলো অগাধ যশ, অর্থ ও ক্ষমতার লোভ। রাণা উঠে পড়ে লাগলেন রাজাদের বোঝাতে, পাকিস্তানে যোগদান কতভাবে তাদের জন্য লাভজনক হবে। জয়সলমির প্রথমেই সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। যোধপুরে প্রজাবিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল, সেই দেখে যোধপুরের রাজাও প্রস্তাবের পক্ষ থেকে সরে এলেন। কিন্তু উদয়পুর ও জয়পুরের রাজারা কতকটা রাজি হয়ে গেলেন। সাফল্যে উৎসাহী হয়ে রাণা গেলেন বরোদায়।

সর্দারের সঙ্গে সারাদিন ব্যাপী ম্যারাথন আলোচনার পর বরোদার রাজা প্রতাপসিংহ গায়কোয়াড়ের কাছে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী পরিকল্পনা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। অশনি সংকেত দেখলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ উদয়পুর ও জয়পুরের রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

উদয়পুর-জয়পুরের রাজাদের বক্তব্য ছিল, ভারতে যোগ দিলে খুব শিগগিরই রাজপাট হারাতে হবে। তার পরিবর্তে পাকিস্তানে যোগ দিলে রাজত্ব থাকবে অক্ষুণ্ণ। বরোদার রাজা বললেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে, রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে। পাকিস্তান ইসলামিক দেশ, হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে না এমন জিদের জন্যই তার জন্ম। বহু নিরীহ হিন্দুর রক্ত লেগে আছে তার হাতে। এমনধারা পাকিস্তানে আমাদের রাজপাট বজায় থাকলেও প্রজাদের সম্মান বজায় থাকবে কি? তাদের ওপর অত্যাচার হবে না তো? ধর্মান্তরের জন্য জবরদস্তি হবে না তো? রাজার রাজত্ব বেশি জরুরি, নাকি প্রজাদের আত্মসম্মান? গায়কোয়াড়ের যুক্তিতে হার মেনে শেষমেশ রাজারা ভারতভুক্তির সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যর্থ রাণা অমরসিংহ রেগেমেগে ফিরে গেলেন অমরকোটে। রক্ষা পেল রাজপুতানা। কিন্তু পঁচাশি শতাংশ হিন্দুর রাজত্ব, থর মরুভূমির প্রবেশদ্বার অমরকোট গিলে ফেলল পাকিস্তান, বিনা প্রতিরোধে।

রূপকথার গল্পের শেষে থাকে— 'সুখের রাজ্যে বাস'। তাই না?

নাহ্, অমরকোটের প্রজাদের ভাগ্যে সেরকম কোনো সুখ জোটেনি। তাদের পাকিস্তানভুক্তির পর সিন্ধু দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাণা অমরসিংহের বংশধরেরা আজও নিজেদের প্রাসাদ ও সম্পত্তি আগলে বসে আছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানভুক্তিতে তাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অমরকোটের প্রজাদের দুর্দশা হয়েছে অবর্ণনীয়। জিন্নার সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি ও সুফিবাদের সহিষ্ণুতার ঢক্কানিনাদের দাম যে বাস্তব জগতে কানাকাড়িও নয়, সেটা নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে উপলব্ধি করেছে অমরকোট। না, অমরকোট নামটা আজ আর নেই, বদলে হয়েছে 'উমরকোট'। ইসলামিক নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে। পাকিস্তানের উদার (!) ইসলামের নমুনা। আজ সে রাজ্যের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দুরা নিয়মিত সেখান থেকে ভারতে পালিয়ে আসছে, দলে দলে। হিন্দু মেয়েদের বলপূর্বক অপহরণ করে জবরদস্তি বুড়োহাবড়া মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রায়শই। পুলিশ অভিযোগ নেয় না, আদালতে গেলেও প্রতিকার মেলে না। আদালত বলে, কোথায় জবরদস্তি? হিন্দু মেয়েরা তো ওই সব বুড়োহাবড়া মুসলমানদের ভালোবেসে ধর্মান্তরিত হয়েছে! মেয়ের বাবা কান্নায় ভেঙে পড়ে রাস্তায় আছাড়ি-পিছাড়ি খায়, কেউ ফিরেও দেখে না। রাণাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার ফল অমরকোটের প্রজারা আজও ভোগ করে চলেছে, বংশ পরম্পরায়। তাদের প্রাণ, সম্মান, সম্পত্তি সবকিছু দিয়ে।

সব রূপকথার গল্পেরই একটা পরিশিষ্ট থাকে। গল্পটা থেকে শেখার কী আছে, বলে দেয় শেষমেশ।

আমার শেষ কথাটুকু পশ্চিমবঙ্গের দিদির হিন্দু সমর্থকদের উদ্দেশে বলি। দিদির ওপর অন্ধ বিশ্বাস করে নিজেদের প্রাণ সম্মান সম্পত্তি সবকিছুর বাজি ধরে জুয়ো খেলছেন আপনারা। তার ফল আপনাদের বংশধরদের ভোগ করতে হবে না তো? অমরকোটের প্রজাদের মতো? দিদি তো ইসলামিক রিপাবলিক গ্রেটার বাংলাদেশের মধ্যে কালীঘাটের জমিদারি নিয়ে আনন্দে থাকবেন।

আপনাদের কী হবে? আবার রিফিউজি হবেন? কোথায় পালাবেন? বিহারে? ঝাড়খণ্ডে? অনুগ্রহ করে সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। অমরকোট, থুড়ি উমরকোটের প্রজাদের পরিণতিটা ভুলে যাবেন না। ■

নবাঙ্কুর

বই পড়া

সেদিন রমাপদবাবু খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলছিলেন বইপড়া লোকের সংখ্যা নাকি কমে যাচ্ছে। গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলি সব ফাঁকা পড়ে থাকছে। কলকাতা শহরের লাইব্রেরিগুলিতে যারা গবেষণা করছেন তাদেরই শুধু আনাগোনা। এ তো খুবই চিন্তার কথা যে মানুষ বই বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠছেন শিক্ষানুরাগীরা।

আজ এই প্রজন্মকে নাকি অ্যানড্রয়েড ফোন গ্রাস করে ফেলেছে। ছোটোরাও ঠাকুমার ঝুলি, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প ছুয়ে দেখছে না। এটাকে কোনও কোনও অভিভাবক হাই স্ট্যাটাস মেনটেন বলে মনে করছেন। বেশিরভাগ বাড়িতে বইয়ের আলমারিও নেই। তারা সাফাই দিচ্ছেন, অ্যানড্রয়েড মোবাইলের প্লে স্টোর থেকে তো সহজেই বিভিন্ন বই, রাইমস, খেলার ছলে পড়া নিমেষের কয়েকটা টাচে ডাউনলোড করে ফেলা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে এই অ্যাপগুলো সবই শিক্ষামূলক ও আপডেটেড তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু একটু নজর করলেই দেখা যাবে আজকের ছোটোরা বেশিরভাগই এই অ্যাপের ফ্যান। তাতে ভীষণভাবে বই বিমুখ হয় পড়ছে তারা।

ডিজিটালাইজড বুক নিশ্চয় ভালো তথ্যের সন্ধান দেয়। তবে যত বেশি ও বিভিন্ন ধরনের বই পড়া যায়, তত বেশি নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। এতে তথ্যের ভাণ্ডার , শব্দের ভাণ্ডার বাড়বে বই কমবে না। ভারতে প্রতি বছর কুড়ি হাজার বই প্রকাশিত হচ্ছে। এই পরিসংখ্যানটি আমাদের দেশকে সপ্তমে স্থান দিয়েছে। ভারত হচ্ছে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ যেখানে ইংরেজি ভাষায় সর্বাধিক বই প্রকাশিত হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বই পড়লে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। অবসাদ থেকে মুক্ত করে। জ্ঞান বৃদ্ধি করে। ভাষার ওপর দখল বাড়ায়। কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়। মনোযোগ বাড়ায়। লেখার দক্ষতা বাড়ায়। যারা সারাদিন প্রচুর কাজের ব্যস্ততায় থাকেন, ডেটলাইন মেনটেন করেন, তারা যদি দিনের কোনও একটা সময় অন্তত আধঘণ্টা নিয়ম করে বই পড়েন তাহলে তাদের জীবনের ট্রেস কমে যেতে বাধ্য। ভুলে যাওয়া রোগও বই পড়ার ফলে অনেক কমে যায়।

স্বামী রামতীর্থ বলেছেন, ভালো বই, সৎ সঙ্গ এবং প্রার্থনা--- এই তিনটির দ্বারা ত্রিলোকজয়ী হওয়া যায়। পিয়ার্সন বলেছেন, যে বই পড়ে না তার মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্মায় না। স্পিনোজা বলেছেন, ভালো ভালো খাদ্যবস্তুতে পেট ভরে, কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে তৃপ্ত করে। লিও টলস্টয় বলেছেন, জীবনে মাত্র তিনটি জিনিসের প্রয়োজন--- বই, বই এবং বই। সিডনি স্মিথ বলেছেন, কোনও আসবাবপত্রই বইয়ের মতো চমৎকার নয়।যে কোনও সফল ব্যক্তির জীবনকথা পড়লে জানা যাবে, তাঁরা বই পড়েই সমৃদ্ধ হয়েছেন। সঠিক ভাবে জীবন গঠন করার জন্য বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সব বাড়িতেই হোম লাইব্রেরি বা ভালো বইয়ের সংগ্রহ থাকা প্রয়োজন। বই ছাড়া বাড়ি শ্রীহীন। ছোটে বন্ধুরা, ফোনের নেশা কাটিয়ে সেই সময় বই পড়ার অভ্যাস কর। বই পড়া খুব ভালো অভ্যাস। বলা হয় বুক ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড।

বইদাদু

ভারতের পথে পথে

ওঙ্কারেশ্বর

নর্মদা ও কাবেরী নদীর মিলনে সৃষ্ট ওঁ-আকৃতির দ্বীপে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির তীর্থ। দু'পাশে মন্দিরময় বিন্ধ্যপর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা। সেখানে ওঙ্কার পর্বতের ঢালে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম স্বয়ম্ভু ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দির। কথিত, সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা কারুকার্যময় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই শহরেরও পত্তন করেন রাজা মান্ধাতা। তাই এই মন্দিরকে লোকে শ্রীওঙ্কার মান্ধাতাও বলে থাকেন। রানি অহল্যাবাঈের নির্মিত শ্বেত মর্মরের নন্দীমন্দির পেরিয়ে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। ওঙ্কারেশ্বরের বাঁ-দিকে ঢালু পথে রয়েছে শঙ্করাচার্য গুহা এবং তাঁর গুরু গোবিন্দপাদের সমাধি। গুহার পাশে কোটিতীর্থ ঘাট। ধাপে ধাপে নেমেছে নর্মদায়। এক সময় মুসলমান আক্রমণে বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায় এখানকার মন্দির। অষ্টাদশ শতকে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নতুন করে মন্দির গড়েন। কাছেই রয়েছে নানা দেব-দেবীর মন্দির ও সাধুসন্তের আখড়া। শিবরাত্রি ও কার্তিকী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে।

জানো কি?

বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য

- উত্তর প্রদেশ— কত্থক, চাপ্পেলী, রাসলীলা, নওটঙ্কি, করণ, জইতা, কাজরী, কুমাওন।
- অন্ধ্রপ্রদেশ— বিতিভাগবতম্ , ওট্টমতেডল, কুচিপুড়ি, কোট্টাম, মোহিনীঅট্টম্।
- মধ্যপ্রদেশ— পাণ্ডবানি, মাচা, লোটা।
- হরিয়ানা— ঝুমুর, সয়াঙ্গ লুর, গাগর, খোর।
- হিমাচল--- মুঞ্জরা, গিড্ডা, পারহাউন, কায়াঙ্গা।

ভালো কথা

গ্রীষ্মকালে পাখির জন্য জল

বোশেখ মাস পড়তেই ঠাকুমা উঠানের ধারে তুলসীতলায় একটি কানাউঁচু থালাতে জল ভর্তি করে রেখে দিতে শুরু করেছে। প্রথম দু'দিন আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। সন্ধেবেলা ঠাকুমা থালার জল ফেলে দিয়ে থালাটি ঠিক জায়গায় রেখে দিত। দু'দিন পরে রোববার ছিল। দেখলাম সারাদিনে বহু পাখি এই থালা থেকে জল খেল। কোনও কোনও পাখি আবার থালার মধ্যে নেমে স্নানও করল। ঠাকুমা বলল সব পাখি একসঙ্গে আসে না। ওরা সব ঠিক করে নিয়েছে। কাক, শালিক, চড়াই, পায়রা সবার সময় ঠিক করা আছে। আমি ঠাকুমকে বললাম তুমি কি ঠিক করে দিয়েছ? ঠাকুমা বলল না ওরাই ঠিক করে নিয়েছে। এই গ্রীষ্মকালে ওরা জল তেষ্টায় খুব কষ্ট পায়। চারিদিকে জল খুঁজে বেড়ায়। আমি মনে মনে ঠিক করেছি আমার বন্ধুদেরও বলব তারা যেন তাদের বাড়িতেও পাখির জন্য জল রাখে।

মধুমিতা সেন, দশম শ্রেণী নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল অ কা ক্ক

(২) কা চ পা ইঁ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) তা দা ন প জ্ঞা বি

(২) বি ষ্ঠা চি নু ত্রা ন

২৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) বীরসিংহ (২) ভাগ্যপরীক্ষা

২৯ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) পূর্বপরিকল্পনা (২) ফলভারাবনত

উত্তরদাতার নাম

(১) পবন দেবনাথ, টাকি, উত্তর ২৪ পরগণা (২) রোহিত শর্মা, চুনাভাটি, পুরুলিয়া।
(৩) শ্রেয়া সিংহ, বড়জোড়া, বাঁকুড়া (৪) শুভ চৌহান, তলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। পরীক্ষিৎ ।। ২২ ।।

পাঁচমেশালি সরকার গঠনের ঝুঁকি মানুষ নেবে না

কে. এন. মণ্ডল

ভারতে ভোট মরশুম চলছে। ভারতবর্ষের দাবি তারাই নাকি বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র। হয়তো জনসংখ্যার নিরিখে এ দাবি যথার্থ। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি কলুষমুক্ত নয়— যেমনটি দেখা যায় অন্যান্য পশ্চাদপদ দেশগুলিতে। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অগণতান্ত্রিকভাবে গণতন্ত্রের প্রয়োগের শিরোপা অবশ্যই পশ্চিমবাঙ্গের প্রাপ্য। ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এ বিষয়ে আর কোনো ধোঁয়াশা নেই। শাসকদল নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের পাওয়া গুটিকতক আসন ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে, এমনকী প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারি দলে শামিল করে। এজন্য তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা কবে, কোন পঞ্চায়েত বা পৌরসভা দখলে নেবেন তার তারিখ আগাম ঘোষণা করতেন। নির্বাচনে একটি আসনও না পাওয়া তৃণমূলের বহরমপুর পৌরসভা দখল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবেই সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসর সঙ্কুচিত করেছে তৃণমূল। প্রায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরের ফলে এত তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলে।

ভারতে গণতন্ত্রের ভিত্তি পঞ্চায়েত পর্যায় হলেও, তার পূর্ণ বিকাশ সংসদীয় গণতন্ত্রে ভারতীয় সংসদকে তাই গণতন্ত্রের পীঠস্থান বা মন্দির বলা হয়। সুতরাং সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিমেয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য, অন্যথায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি মূল্যহীন হয়ে যায়। ভারতীয় সংবিধান এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে নিষ্কলুষ, অবাধ এবং নিরপেক্ষ রাখার জন্য সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। বহুদলীয় রাজনীতিতে ভোট প্রক্রিয়া সরকারি প্রভাবমুক্ত রাখতে এরকম একটি স্বাধীন সংস্থা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের গর্ব। স্বাধীনতার উত্তরকালে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্বাচনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এই নিরপেক্ষতা আছে বলেই প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন সেস্‌ন মাথা উঁচু করে বলতে পেরেছেন, ''I am the Election Commission of India–not of the Govt. of India.'' বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রে জনমতের ভিত্তিতেই জনপ্রিয় সরকার গঠিত হচ্ছে মসৃণভাবে, নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এমনও দেখা যাচ্ছে, ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন কমিশনের দিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগকারীরাই অনেকে নির্বাচিত হচ্ছেন বা সরকার গঠন করছেন। এতেই প্রমাণ হয় কমিশন নিরপেক্ষ। এহেন একটি সাংবিধানিক সংস্থাকে নিজেদের রাজনৈতিক তাগিদে বা স্বার্থে যে বা যাঁরা কালিমালিপ্ত করে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে ভারতীয় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করছেন, তাদের ঘৃণ্য রাজনীতি যাতে পরাজিত হয়, তা দেখার দায় দেশবাসীর।

ভারতের গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে পিছনের দরজা দিয়ে যে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ...শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারত গঠনে একটি স্থায়ী সরকার দরকার, কোনো পাঁচমিশালি সরকার ভারতের অখণ্ডতা এবং অগ্রগতির নিশ্চয়তা দিতে অপারগ।

যেহেতু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি তাই তৃণমূল নেত্রী এই লোকসভা ভোটের মুখে কোনো তথ্য নির্ভর ছবি পাচ্ছেন না বলেই তিনি দিশেহারা। আর এই দিশেহারা এবং অনিশ্চয়তা থেকেই তিনি প্রলাপ এবং পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন। তৃণমূল-বিজেপি যোগ ঐতিহাসিক সত্য এবং

তৃণমূল নেত্রী রেলমন্ত্রী থাকাবস্থায় বাঙ্গলার জন্য যে কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছেন তাও তো বিজেপি (এনডিএ) সরকারের অবদান, কেননা তিনি তো সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে তিনি সিপিএম-কংগ্রেসকে বিজেপির দোসর বলছেন। অথচ ওই দুটি দল আদর্শগত এবং বাস্তব রসায়নেই বিজেপি বিরোধী। তৃণমূল নেত্রী প্রতিটি রাজনৈতিক সভায় নিয়মিত বলছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহ ওকে ভয় দেখাচ্ছেন। আপনি যদি কোনো অনিয়ম না করে থাকেন তাহলে ভয় কীসের? বরং বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, প্রতিটি জনসভায় আপনি বিরোধী ভোটারদের পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর। তাইতো আপনাকে বলতে হয় 'মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কয়দিন। ভোটের পরে আমার পুলিশই থাকবে।' আচ্ছা আপনি বলুন তো, পুলিশ আপনার দলের না রাজ্যের— আর ভোটের পরে পুলিশ থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে পালা করে একথা বলার উদ্দেশ্য কী? ভোট যতই শেষের দিকে তৃণমূল নেত্রী ততই লাগামহীন হচ্ছেন। প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন— রাজ্যে সমান্তরাল সরকার চালানোর অভিযোগ তুলে। এমনকী তিনি এবং তাঁর পারিষদবর্গ কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পর্যবেক্ষকদের বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলছেন। অতি উৎসাহী তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের কেউ কেউ পর্যবেক্ষক বা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অগ্নিগর্ভ করে তুলছেন। পরিস্থিতি এমন হয়ে যাওয়ায় দুই দফা নির্বাচনে ব্যাপক হিংসা এবং অনিয়মের অভিযোগ, সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনাও ঘটছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলী গুলিয়ে দিয়ে, পর্যাপ্ত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের সময়মতো বুথ পর্যায়ে ছড়িয়ে না দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত অফিসারদের বদলিতেই কী এত রোষ? নির্বাচন কমিশনের এসকল ব্যবস্থা তো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের তাগিদে— তাতে আপনার এত ভয় কেন? ভয় পেয়ে আবোল-তাবোল না বকে, কোনো অনিয়ম বা সংবিধান বহির্ভূত কাজ হলে আদালতে যাচ্ছেন না কেন? আপনি পোড়-খাওয়া রাজনীতিক। আপনার জানা আছে— আপনার এ বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত।

নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকেই বিরোধীদের প্রচারে বাধা দান, প্রার্থীদের উপর হামলা, নেতা-মন্ত্রীরা ভোট কেন্দ্রে ঢুকে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং বিরোধী এজেন্টদের শাসানো এবং মারধরের ঘটনার খবর আসছে। ক্রমাগত বিরোধী রাজনৈতিক পরিসর আটকে দেওয়ার চেষ্টা, তাদের প্রচারে বাধা দানের ফলে মরিয়া হয়ে বিরোধীরাও কোথাও কোথাও সহিংস হয়ে উঠছে। তার দায় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের— যাঁরা রক্ষকের বদলে ভক্ষকের ভূমিকায় রয়েছেন। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোনো শান্তিপ্রিয়, নিরীহ নির্ভেজাল ভদ্রলোক ভোটকেন্দ্রিক আলোচনা, সমালোচনা প্রকাশ্যে করতে শিহরিত হচ্ছেন। তাদের রাজনীতিতে যোগদানতো দূরস্থান। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণনের দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'অপরিচ্ছন্ন এই অজুহাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে অবজ্ঞাভরে অবহেলা করলে সর্বাধিক যে মূল্য দিতে হয় সেটা হলো— নিকৃষ্টতর মানুষ কর্তৃক শাসিত হওয়া।' সম্মানিত রাষ্ট্রপতির এহেন বক্তব্যের পরেও বর্তমান পরিস্থিতিতে কতজন ভদ্রলোক রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবেন তা ভেবে দেখার।

তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা যতই আস্ফালন করুন না কেন--- ৪২য়ে ৪২, মুখ্যমন্ত্রী গোয়েন্দাসূত্রে প্রকৃত অবস্থা অবহিত আছেন বলেই এত ভীত-সন্ত্রস্ত। আসলে উনি Trust deficit এ ভুগছেন। আর এই পরিস্থিতির জন্য উনি নিজেই দায়ী। এই আত্মবিশ্বাস হারানোর কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, পুলওয়ামায় আধাসেনার উপরে আক্রমণে জইশ-ই-মহম্মদের জড়িত থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী এর জন্য দায়ী করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। সেখানে থেমে না থেকে বিনা প্রমাণে পাকিস্তানকে দোষারোপ করার জন্য ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান-প্রিয় মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের একাংশকে খুশি করার জন্য। আবার অন্যদিকে বালাকোটে ভারতীয় বিমান হানায় মৃতের সংখ্যা জানতে চেয়ে পাকিস্তানের নৌকায় পাল তুলেছেন। এভাবেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং বাঙ্গলায় মুখ্যমন্ত্রীর জাতীয়তাবিরোধী একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। অতএব তৃণমূলের ভোট বাক্সে ঘাটতির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, যে কারণে সযত্নে লালিত মুখ্যমন্ত্রীর 'সততার প্রতীক' ভাবমূর্তিটি নষ্ট হয়েছে, তা হচ্ছে নারদা-সারদা কাণ্ডে জনগণের টাকা আদালতে খরচ করে সিবিআই তদন্ত ঠেকানোর অসফল প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে সারদা তদন্ত গুলিয়ে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে বাঁচানোর জন্য ধরনা। সম্ভবত, মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তিতে শেষ পেরেকটি পোতা হয় সোনাপাচার কাণ্ডে এয়ারপোর্ট থানার অফিসারদের দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জির স্ত্রী অভিযুক্ত রুজিরাকে ছাড়িয়ে আনা। ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার পথে কলকাতা বিমান বন্দরে রুজিরার সন্দেহজনক ব্যাগ তল্লাশিতে বাধা দিয়ে কাস্টমস্ অফিসারদের হাত থেকে রাজ্য পুলিশের অফিসাররা কার নির্দেশে রুজিরাকে ছাড়িয়ে নিল--- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রীকে এর জবাব দিতে হবে।

ভারতের গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে পিছনের দরজা দিয়ে যে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তাই ১৯৭৭-৭৮ এর পুনরাবৃত্তি ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী কখনোই মেনে নেবেন না। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ শিখেছেন— শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারত গঠনে একটি স্থায়ী সরকার দরকার, কোনো পাঁচমিশালি সরকার ভারতের অখণ্ডতা এবং অগ্রগতির নিশ্চয়তা দিতে অপারগ। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১০ বছরে একটি দুর্বল যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা এখনো দগদগে। ভারতের অর্থনীতি যখন শক্ত ভিতে দাঁড়িয়ে, মুদ্রাস্ফীতি গত ৫০ বছরের সর্বনিম্ন, জিডিপি চীনকে ছাড়িয়েছে, বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্যবন্ধু দেশ হিসেবে ভারত উপরের দিকে, তখন একটি নড়বড়ে, পাঁচমিশালি সরকার গঠনের ঝুঁকি ভারতবাসী নেবেন না, এটাই প্রত্যাশা।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তফাত শুধু শিরদাঁড়ায়

সোমনাথ গোস্বামী

বেশ কয়েক বছর থেকে যে শব্দবন্ধটি সংবাদমাধ্যমে সব থেকে বেশি আলোচিত হচ্ছে তা হলো হিন্দুত্ব। দেশের যে কোনো প্রান্তের কোনো ঘটনাকে হিন্দুত্বের আতসকাঁচে ফেলে তার বিশ্লেষণ শুরু হয়। এদেশের সংবাদমাধ্যমের কাছেও নিশ্চয় কোনো পদ্ধতি অথবা মাপকাঠি আছে যেখানে হিন্দুত্বের পরিমাপ করা যায়। কিছু মুখরোচক শব্দ সৃষ্টি করে হিন্দুদের চেতনাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা বহুকাল ধরে হয়ে এসেছে। তাই কেউ পৈতেধারী ব্রাহ্মণ সেজে মন্দিরে গেলে কিংবা হিজাব ছেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলেই তাঁর থেকে বিশুদ্ধ হিন্দুত্বের সুগন্ধ বেরোয়। এযাবৎ অবচেতন থাকা তাঁদের হিন্দু মনন হঠাৎ প্রবল আধ্যাত্মিকতার চৈতন্যে উদ্বেলিত হয়। হিন্দুত্বের এমন কদর্য সহজলভ্য অভিনয় এর আগে এদেশে দেখা গিয়েছে কিনা জানা নাই। স্বাধীনতার পর থেকেই হিন্দুত্বকে নিছক একটি উপাচারে নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলেছে যেখানে সামান্য কিছু কসরত করলেই বিশুদ্ধ হিন্দু হয়ে উঠে হিন্দুদের ভোট চাওয়া যায়। সভ্যতা থেকে জাতি আর জাতি থেকে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় হিন্দু শব্দটির ব্যাপ্তি ক্রমাগত ক্ষয় হতে হতে এখন নিছক বাহ্যিক উপাচারে এসে পরিণত হয়েছে। হিন্দুত্বের পরিভাষা নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। আমাদের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখাতে পাবো হিন্দু শব্দটি প্রথমে ভৌগোলিক অর্থে, পরে জাতি অর্থে এবং শেষে এটি ধর্মীয় রূপ পেয়েছে।

মিশর বা ব্যাবিলনের সভ্যতা যখন পৃথিবীর আলো দেখেনি তখন সিন্ধু নদীর অববাহিকার বাতাসে যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া মিশেছে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে চারিদিক মুখরিত হয়েছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার সময়েও যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ একাধিক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার পর থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু বৈদেশিক জাতি যারা সিন্ধু নদী অতিক্রম করে এই পুণ্যভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে তাঁরা কেউ না এক শতক ভূমি দখল করতে পেরেছে না তাদের পৃথক জাতিসত্তা এই ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে প্রবল কোন্দলে লিপ্ত থাকলেও, নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে আপোশহীন সংগ্রাম করে গিয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দ থেকে ইউরোপীয় শাসকের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই সংগ্রাম নিরন্তর চলেছে। তারপর ইংরেজ শাসকেরা একটু একটু করে ইতিহাসকে বিকৃত করে হাজার হাজার বছর ধরে সযত্নে লালিত এই সংস্কৃতিকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু ইংরেজ শাসকেরাও যা করে উঠতে পারেনি, কংগ্রেস তা করে দেখিয়েছে। এই বিরাট বিস্তৃত সভ্যতাকে দ্বিজাতি তত্ত্বের কুঠারাঘাত করে সিন্ধু নদীর অববাহিকা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বৈদেশিক শত্রুর হাতে দান করা হয়েছে। তাতেই ক্ষান্ত হয়নি, খণ্ডিত ভূভাগ নিয়ে যে জাতিসত্তা বেঁচে রইল তাকে ক্রমাগত তথাকথিত সেকুলারিজমের জগদ্দল পাথরে চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করার নানা রকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আজ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের ছত্রছায়ায় যখন সেই সভ্যতার গরিমা পুনস্থাপিত হওয়ার পথে এগোচ্ছে, তখন কংগ্রেস ও কংগ্রেসের উপজাত দলগুলি প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে। হিন্দু যখন বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত একটি ধর্মীয় পরিভাষার সংকীর্ণতা সরিয়ে তার পৃথিবীর প্রাচীনতম গৌরবময় জাতিসত্তার কৌলিন্য ফিরে পেতে শুরু করেছে, তখন কংগ্রেস সভাপতি তথা তার সহযোগী আঞ্চলিক নেতারা মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন করে নিজেদের হিন্দুত্বের অভিনয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যমণি মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের মন্দির নির্মাণে তাঁদের আপত্তি আছে, হিন্দু সংস্কৃতির বুনিয়াদ যে নারীর মর্যাদা, সেই নারীদের তিন তালাকের মতো ঘৃণ্য প্রথা থেকে মুক্তি দেওয়ার তারা বিরোধিতা করে, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচার আকুতি নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রতিবেশী দেশে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের পাওয়া যাবে না। তাঁরা কিন্তু হিন্দুত্বের অভিনয় করবেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা তাঁদের অভিনয় হলেও মন্দিরমুখী করতে পেরেছে, তাদের বিলুপ্ত হিন্দুত্ব দীর্ঘ শীতঘুম ভেঙে আড়মোড়া ভেঙে সোজা রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে, এর জন্য নরেন্দ্র মোদীর নিশ্চয় তাঁদের কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য।

ওড়িশায় ‘ফণী’তে বিপর্যস্ত এলাকা আকাশপথে পর্যবেক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৬ মে ওড়িশা সফর করেন। ৩ মে ‘ফণী’তে বিপর্যস্ত রাজ্যের পরিস্থিতি তিনি পর্যালোচনা করেন। পিপিলি, পুরী, কোনারক, নিমপাড়া এবং ভুবনেশ্বরে ‘ফণী’তে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি তিনি আকাশপথে ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল, অধ্যাপক গণেশি লাল, মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী এরপর ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রবীণ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যকে সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি অবিলম্বে এক হাজার কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। এর আগে, ২৯ এপ্রিল ৩৪১ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রের আন্তঃমন্ত্রী পর্যায়ের একটি দলের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী, ওড়িশাবাসীকে সহমর্মিতা জানিয়ে বলেন, শুধু দ্রুত ত্রাণ সাহায্যই নয়, রাজ্যের পুনর্গঠন নিশ্চিত করতে কেন্দ্র অঙ্গীকারবদ্ধ। কৃত্রিম উপগ্রহ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস-সহ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে প্রাণহানি কম হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার, ১০ লক্ষের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এবং আবহাওয়া দপ্তরের নিখুঁতভাবে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার বিষয়টির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকায় জীবনহানি কম হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী বলেন, একটি উপকূলবর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা থাকায় এই ধরনের ঘূর্ণিঝড় কতটা ধ্বংসাত্মক হয় তা তিনি জানেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, পরিকাঠামো, আবাসন, কৃষি খামার এবং মৎস্যজীবীদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় দল খুব শীঘ্রই রাজ্য সফর করবেন। বিদ্যুৎ, টেলি-যোগাযোগ ও রেল দপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের তিনি পরিষেবা দ্রুত চালু করার নির্দেশ দেন। যে সমস্ত রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলিকে দ্রুত মেরামতির জন্য সড়ক এবং ভূতল পরিবহণ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার কৃষকদের শস্য বিমা সংক্রান্ত আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তিনি বিমা কোম্পানিগুলিকে দ্রুত পর্যবেক্ষক পাঠাতে বলেন। ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী এককালীন ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। তিনি আশ্বাস দেন, রাজ্যের মানুষদের এই বিপদের দিনে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পুরীর গ্রামগুলিতে ত্রাণশিবির নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘূর্ণিঝড় ফণীর কারণে পুরী সংলগ্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে দ্রুত ত্রাণ কাজের জন্য ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তিনটি জাহাজের হেলিকপ্টারকে কাজে লাগানো হয়েছে। যেসব জায়গার সড়ক যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন, সেখানে হেলিকপ্টার থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলা হচ্ছে। পুরীর পেঁটাকোটা গ্রামে ৫ মে থেকে হাজার হাজার মানুষের জন্য ত্রাণ শিবির এবং সর্বজনীন রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইএনএস চিল্কা জাহাজের জল শোধনাগার থেকে ছত্তরগড় গ্রামে ৫ হাজার লিটার জল সরবরাহ করা হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে বিশাখাপত্তনম থেকে সড়কপথে আরও ৫ হাজার লিটার বোতলবন্দি জল পাঠানো হয়েছে।

কালীজাই ভাসমান জেটি সংলগ্ন এলাকা নিরাপদ রাখার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আইএনএস চিল্কার ৬ জন ডুবুরির একটি দল দু'ঘণ্টা ধরে বালি ও প্লাস্টিক-সহ নানারকম জৈব বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে বায়ু প্রবাহের ফলে জেটিতে এইসব জিনিস জমা হয়েছিল। ওই জেটি থেকে পর্যটকদের নৌকা করে দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। ওড়িশার চাত্তরাগড় এবং জানকিয়া গ্রামে নৌ-বাহিনীর চিকিৎসকের একটি দল শিবির খুলে ১৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। এখান থেকে অনেককে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামগুলিতে জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য মেডিকেল টিমগুলি পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের খাদ্য বণ্টনের জন্যও দলটি সাহায্য করছে।

রাহুলের কেলেঙ্কারি এবার পাতাল ফুঁড়ে বেরোচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ মে এক বিশাল জনসভাকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন— "রাহুল গান্ধীর দুর্নীতিগুলি এবার আকাশ-স্থল-জল ফুঁড়ে প্রকাশ্যে আসছে।" এই সূত্রে মোদী বলেন কংগ্রেস সভাপতির ব্যবসার অংশীদার Ulrik Mcknight- এর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও Scorpene Submarine-এর প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ offset contract পকেটস্থ করেছিলেন। লন্ডনে রাহুলের কোম্পানি back up-এর ডায়রেক্টর ছিলেন প্রিয়াঙ্কা বঢরা ও উলরিক। প্রধানমন্ত্রী back up-এর নাম নিয়ে মন্তব্য করে বলেন এক্ষেত্রেও কংগ্রেস সভাপতি পেছনে থেকে সঙ্গোপনে তাঁর কাণ্ডকারখানা চালিয়েছেন। সংস্থাটির পত্তন হয়েছিল ভারতে ২০০২ সালে।

২০০৩ সালে একই নামে লন্ডনে একটি কোম্পানি খোলা হয় যাদের কাজ ছিল মূলত বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে অন্য কোম্পানির হয়ে বরাত আদায়ের দালালির। এই back up কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরকারি মহলে প্রভাব খাটিয়ে সাবমেরিনের অফসেট চুক্তি সহজেই আদায় করে নেয়। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী বলেন যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি করতে দিল্লি-লন্ডন ছুটে বেরিয়ে অংশীদারকে অন্যায্য প্রতিরক্ষা বরাত জুটিয়ে দেয় তারাই আবার জইশ মহম্মদ প্রধান আজহার মাসুদের ওপর রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই নির্বাচনের সময়ই কেন আন্তর্জাতিক জঙ্গির তকমা আঁটলো তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। উত্তর প্রদেশের বাদোহীর এক সভায় মোদী আক্ষেপ করে বলেন যতবারই কংগ্রেসি 'নামদার' তাঁকে অযথা কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেন ততবারই তাঁর একটা না একটা নতুন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকার খবর সামনে এসে যায়। মোদী বলেন এঁরা শুধুই রায়বেরিলি ও আমেথির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে আখের গোছাতে দিল্লি-লন্ডন ধাওয়া করেন। তাঁদের পক্ষে আমজনতার গৃহ বা শৌচাগার নির্মাণের বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা থাকতেই পারে না।

ইউপিএ জমানায় এক লক্ষ কোটি টাকার বরাত অনিল আম্বানীর কোম্পানিগুলিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবশেষে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন স্বয়ং বহু আলোচিত রিলায়েন্সের অনিল ধীরুভাই আম্বানী গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানী। দিল্লিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করে আম্বানী বলেন কংগ্রেস পরিচালিত শেষ ইউপিএ জমানায় তাঁর সংস্থাগুলি ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাত পেয়েছিল। এগুলি ছিল বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ সংক্রান্ত। রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে অনিল জানান, "তাঁরা রাহুল গান্ধীকে স্পষ্ট ভাষায় মনে করিয়ে দিতে চান যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের ১০ বছরের মেয়াদে (২০০৪-২০১৪) তাঁর নেতৃত্বে চলা রিলায়েন্সের কোম্পানিগুলি জাতীয় গুরুত্বের বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পগুলিতে কাজ করার বরাত পেয়েছিল। সেই সময় নিশ্চয় রাহুলের মনে আছে সরকার

পরিচালনার নেতৃত্বে ছিল তাঁরই দল কংগ্রেস।"

রিলায়েন্স গ্রুপের তরফে রাহুলের কাছে সুনির্দিষ্ট করে জানতে চাওয়া হয় যে সেই সময় তাঁর দল কি একজন তথাকথিত crony capitalist ও দুর্নীতিগ্রস্তকে সমর্থন করেছিল। আম্বানী জানান এই ব্যাখ্যা রাহুলকে বিশদে দিতে হবে। এই মর্মে সংস্থার তরফে লিখিত বিবৃতিতে জানানো হয় যে দীর্ঘদিন ধরে রাহুল গান্ধী নিয়ম করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বালখিল্যসুলভ প্রবণতায় ভিত্তিহীন সংবাদ, বিকৃত সংবাদ ও অন্যের পক্ষে চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য ছড়িয়ে চলেছেন। তাঁর কাজকর্ম দেখে মনে হয় তিনি কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বদনাম প্রকল্প চালাচ্ছেন।

ইকনোমিক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাহুল নির্দিষ্ট করে অনিল আম্বানীকে একজন crony ও অসৎ ব্যবসাদার হিসেবে যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ এমনটাই জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে।

স্করপিন শ্রেণীর চতুর্থ ডুবোজাহাজ 'ভেলা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্করপিন শ্রেণীর চতুর্থ ডুবোজাহাজ 'ভেলা'র গত ৬ মে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের সচিব ড. অজয় কুমারের পত্নী শ্রীমতী বীণা অজয় কুমার অত্যাধুনিক এই ডুবোজাহাজটি জলে ভাসান। মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এই ডুবোজাহাজটি নির্মাণ করেছে। অনুষ্ঠানে ভাইস অ্যাডমিরাল এ কে সাক্সেনাও উপস্থিত ছিলেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এই ডুবোজাহাজ তার অন্যতম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাজগাঁও ডক থেকে ডুবোজাহাজটিকে মুম্বাই বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর হেফাজতে তুলে দেওয়ার আগে

ডুবোজাহাজটির বন্দর ও সমুদ্রে একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, স্করপিন শ্রেণীর ছ'টি ডুবোজাহাজ নির্মাণে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ফ্রান্সের ন্যাভাল গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অঙ্গ হিসেবে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এই ডুবোজাহাজগুলি নির্মাণ করছে। মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডায়রেক্টর কমোডর রাকেশ আনন্দ জানিয়েছেন, গত ২০ এপ্রিল পি-১৫বি ডেস্ট্রয়ার 'ইম্ফল' এবং ৬ মে স্করপিন শ্রেণীর ডুবোজাহাজ 'ভেলা'র আনুষ্ঠানিক সূচনা নিঃসন্দেহে এক বড়ো সাফল্য। বর্তমানে আটটি যুদ্ধজাহাজ ও পাঁচটি ডুবোজাহাজ নির্মাণের কাজ চলছে। ভারতের অগ্রণী যুদ্ধজাহাজ ও ডুবোজাহাজ নির্মাতা সংস্থা মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড ভারতীয় নৌ-বাহিনীর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দেশের একানব্বইটি প্রধান জলাধারে জলস্তর এক শতাংশ হ্রাস পেয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের ৯১টি প্রধান জলাধারে এখন ৪০,৫৯২ বিসিএম (বিলিয়ন ঘন মিটার) জলের সঞ্চয় রয়েছে। এই পরিমাণ এই জলাধারগুলির সঞ্চয় ক্ষমতার ২৫ শতাংশ। ২০১৯-এর ২৫ এপ্রিল এই হার ছিল ২৬ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এখনও পর্যন্ত সঞ্চিত জলের পরিমাণ ১১৫ শতাংশ হয়েছে এবং গত ১০ বছরে এই পরিমাণ ১০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে এই প্রধান ৯১টি জলাধারের সঞ্চয় ক্ষমতা ১৬১.৯৯৩ বিসিএম। এগুলির মধ্যে ৩৭টি জলাধারের জল ব্যবহার করে ৬০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

দেশের জলাধারগুলির মধ্যে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে গত বছরের তুলনায় জলের সঞ্চয় সন্তোষজনক বলে জানা গেছে। অনুরূপভাবে, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ত্রিপুরা-সহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও ১৫টি জলাধারে জলসঞ্চয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক বলে জানা গেছে। তবে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র-সহ পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে গত বছরের তুলনায় মোট ২৭টি জলাধারে সঞ্চিত জলের পরিমাণ বেশ খানিকটা কমেছে। এমনকী, গত ১০ বছরের গড় হারের তুলনাতেও এই অঞ্চলের জলাধারগুলিতে জল কম রয়েছে। তবে, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, চণ্ডীগড়-সহ ১২টি জলাধারে অবশ্য গত বছরের তুলনায় সঞ্চিত জলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ৩১টি জলাধারেও চলতি মরশুমে গত বছরের তুলনায় জলসঞ্চয়ের পরিমাণ বেশ ভালো বলে কেন্দ্রীয় জল কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে।

নৌ-বাহিনীর ডরনিয়ার বিমানের আকাশপথে সমীক্ষা— পুরীর আশপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুরী লাগোয়া উপকূল অঞ্চলে আছড়ে পড়া মারাত্মক তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'র প্রভাব পুরী ও আশপাশের এলাকায় বহু গাছ পড়ে যাওয়ার ছবি পাওয়া গেছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'র প্রভাব নিরূপণে নৌ-বাহিনীর ডরনিয়ার যুদ্ধবিমানকে সমীক্ষার কাজে মোতায়েন করা হয়। এই যুদ্ধবিমান থেকে পাওয়া ছবিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মিলেছে। ছবিতে আরও দেখা গেছে, পুরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী বিভিন্ন সড়কে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গিয়ে সাময়িকভাবে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকী, পুরী রেল স্টেশনের ছাদের একাংশ এই ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেছে। পুরী ও চিলকা হ্রদের মাঝামাঝি নীচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়েছে। সমীক্ষার সময় যুদ্ধবিমানের পাইলটরা ৫০ নট গতিতে হাওয়া বইছে বলেও লক্ষ্য করেছেন। এছাড়াও, সমীক্ষার সময় তোলা একাধিক ছবি ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিনিময় করা হচ্ছে।

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তান-প্রেম

বিমলেন্দু ঘোষ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের সফল পরিসমাপ্তি হয়েছিল ১১৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের লে: জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে ঢাকায় পাকিস্তানের লে: জেনারেল নিয়াজির নিঃশর্ত আত্ম সমর্পণে।

মুসলমান সত্যশোধক মণ্ডল-এর প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান সমাজ- সংস্কারক হামিদ দলওয়াই মুম্বইয়ের একটি বিশেষ পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। বিশিষ্ট গ্রন্থকার শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় ছিল। সেই সুবাদে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ও সীমান্তের ওপারে এবং ত্রিপুরার মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শৈলেশবাবুর সাহায্য নিয়েছিলেন। শৈলেশবাবুর 'দাঙ্গার ইতিহাস' গ্রন্থসূত্রে ('মুসলমানদের প্রতি'— অধ্যায় ১৫, পৃ. ২৮০-২৮১) জানা যায়, মুম্বই ফিরে যাবার আগে হামিদ দলওয়াই তাঁকে বলেছিলেন— এদেশের মুসলমানরা চায়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। মুজিব তাঁদের কাছে বঙ্গবন্ধু নন, মুসলমানদের পরম অকল্যাণকারী। ভারতীয় মুসলমানদের ওই বিচিত্র মানসিকতার কারণ ব্যাখ্যা করে দলওয়াই বলেছিলেন— তাঁরা মনে করেন অখণ্ড পাকিস্তান ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশের উপর যতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে, পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হলে তা আর সম্ভবপর হবে না। ঠিক সেই মুহূর্তে সেদিন দলওয়াইয়ের কথা শৈলেশবাবু বিশ্বাস করতে চাননি। তার পর তিনি বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে বুঝেছিলেন, হাসিদ দলওয়াইয়ের কথা কত খাঁটি। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতীয় মুসলমানদের বড়ো একটা অংশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধী ছিল।

১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রমন্ত্রী নবাব কাজেম আলি মির্জা বিধানসভায় 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' এই মর্মে একটি বেসরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। বিধানসভার নির্দল সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোজা সেই প্রস্তাবে সই করতে রাজি না হওয়ায় কাজেম আলি তাঁকে ব্যঙ্গ করে কিছু কথা বলেছিলেন। বদরুদ্দোজা সাহেব রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে তার উত্তরে বলেছিলেন— কাজে আলি আমাকে ঘাঁটিও না। র‍্যাডক্লিপ সাহেব যখন মুর্শিদাবাদ ইন্ডিয়াকে দিলেন তখন তুমি এখান থেকে ছুটে করাচি যাওনি? লিয়াকত সাহেবের কাছে নিয়ে কান্নাকাটি করোনি? সূত্র : 'বদসংহার এবং' (১৯৪৬-১৯৫০); সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, পৃ. ৬৮।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতভাগ ও শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ড. জাকির হোসেন সে সময় ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস সার্ভিসের একটি কনফারেন্স উপলক্ষ্যে মাদ্রাজে যান। সেখান থেকে ১০ জুন তিনি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার লেটার হেড ব্যবহার করে 'Respected Quaid-i-Azam'-কে লিখেছিলেন যে, তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই পাকিস্তান সম্ভব হয়েছে ("...Pakistan which your almost superhuman efforts have brought into being")। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন— "If I can be of any service in framing of educational programmes, I shall deem it a privilege to be able to do so"---(The Telegraph, 16.2.1992)।

উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে পণ্ডিত নেহরু সরকারের আমলে ড. জাকির হোসেন ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছিলেন। ■

সাপ্তাহিক রাশিফল

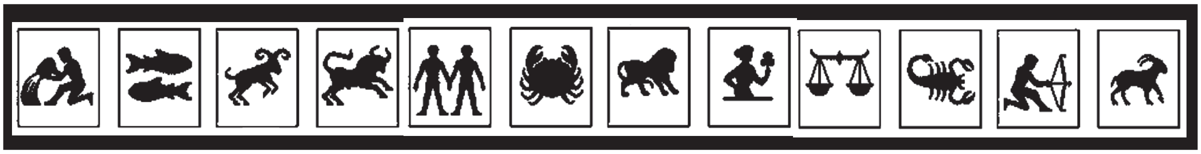

১৩ মে (সোমবার) থেকে ১৯ মে (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বুধ, মিথুনে রাহু, মঙ্গল, বৃশ্চিকে বক্রী, বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, শনি, কেতু, মীনে শুক্র। পুনশ্চ ১৫ মে, বুধবার সকাল ১০-৪২ মিনিটে রবির বৃষে প্রবেশ এবং ১৮ মে, শনিবার, সকাল ১১-৫২ মিনিটে বুধের বৃষে পদার্পণ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে মঘা নক্ষত্র থেকে বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ সন্তানের মেধা থাকা সত্ত্বেও চালাকিতে কৌশলী মানসিকতা ও মনসংযোগের অভাব হেতু বিলম্বিত সাফল্য। ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রতিবেশীর বিরোধিতায় পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেকাংশে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। শরীরের মধ্যভাগের চোট-আঘাত, সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ। গৃহলক্ষ্মীর বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে সামাজিক ও সাংসারিক সুস্থিতি ও অভিজাত্য গৌরব।

বৃষ ঃ পারিবারিক পরিস্থিতিতে মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ। কর্মক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় হঠাৎ উদ্ভূত জটিলতার অবসান ও অগ্রগতি। বিশেষ কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রমোটিং, দালালি, চর্ম, পশম ইত্যাদি ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ প্রাপ্তি শুভ। কর্মের যোগসূত্রে বিবাহ বন্ধনের যোগ।

মিথুন ঃ প্রবাসে দৈবের বশে শ্রদ্ধাবান প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সখ্য। উজ্জ্বলবুদ্ধি, উদারতা, সৌন্দর্যসুধায় প্রকৃত সম্মান। বিদ্যার্থীর ক্রমবর্ধমান উৎসাহ, মনসংযোগ বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতি, বাড়ি-গাড়ি অথবা পৈতৃক ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গের ছদ্মবেশী দরদি রূপের মোহে সময়ের অপচয় ও সম্মানহানি।

কর্কট ঃ কর্মজনিত যশ-সম্মান, অর্থ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। তীর্থদর্শন, পুণ্যকর্ম, সুকীর্তি, আধিপত্য, ধর্মচিন্তা। প্রতিবেশী অথবা বিদেশে অবস্থানকারী সুহৃদের সঙ্গে সুসম্পর্ক হানি। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলীদের সৃজনশীলতা, যশ, খ্যাতি ও প্রতিভা। সপ্তাহের শেষভাগে সরলতা ও দয়ার্দ্রহৃদয়ের কারণে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। বয়স্কদের রক্তচাপ ও বদহজম জনিত চিকিৎসার প্রয়োজন।

সিংহ ঃ প্রতিবেশী, স্বজনবাৎসল্য, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা, উদার দৃষ্টিতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ভরপুর মন ও ভালো সুহৃদ সম্পর্ক। চঞ্চল মানসিকতায় কর্মস্থানে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা, উদ্বেগ, স্থানান্তর, কুহকিনীর কৌশলী মানসিকতায় রাহুর গ্রাস ও চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্ক লেপন। স্নেহভাজন ও পোষ্যদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়।

কন্যা ঃ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অধীত বিদ্যা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার নতুন দিশায় প্রতিভার স্বাক্ষর। সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর ভাগ্যোদয়ের নতুন দিশা। গৃহসরঞ্জাম বিলাসদ্রব্য ক্রয় ও মৌলিক চিন্তাভাবনা ও স্বীয় আদর্শের বাস্তবায়ন। বিবাহপ্রার্থীদের লক্ষ্যপূরণ। মাথাব্যথা, অনিদ্রা ও দাঁতের চিকিৎসার প্রয়োজন।

তুলা ঃ সন্তান, মিত্রে কারণে বুদ্ধিবিভ্রম, বিরূপ সমালোচনা ও মূল্যবান সামগ্রী হানি। আয়ের গতি মন্থর। পারিবারিক চিকিৎসা ও পড়াশুনার অপ্রত্যাশিত ব্যয়। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয়ে সতর্কতা অবলম্ব জরুরি। অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার কাজে ছেদ প্রাপ্তি। কোনো ভালো কাজে সুনামের পরিবর্তে বদনাম যোগ।

বৃশ্চিক ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। পৈতৃকসূত্রে ও শৌখিন ব্যবসায় প্রাপ্তির ক্ষেত্র শুভ। কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতায় দায়িত্ব নির্বাহ। স্ত্রীর সাহায্যে বৈষয়িক উন্নতি ও পারিবারিক সমৃদ্ধি। গুরুজনের বার্ধক্যজনিত কারণে ক্রনিক অসুস্থতায় উদ্বেগ, অবসাদ। হার্ট ও বাতজ বেদনায় ক্লেশ ভোগ।

ধনু ঃ আয়-ব্যয়ের সমতারক্ষা কঠিন। রমণীর সান্নিধ্য, জেদ ও ভাবাবেগ পরিহার করুন। সপরিবারে ভ্রমণ ও আনন্দলাভ। গুরুজনের পরামর্শ ও আশীর্বাদে ব্যবসায় সাফল্য, ছিদ্রান্বেষী ও বয়স্ক মিত্র হিতকর নহে। স্বীয় আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণতায় সামাজিক স্বীকৃতি।

মকর ঃ আয়ের শ্লথ গতি। উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। পারিপার্শ্বিক কারণে মানসিক চাপ থাকলেও দক্ষতা ও অধ্যাবসায়ের কারণে প্রশংসাপ্রাপ্তি। ভ্রাতা-ভগ্নীর কারণে ও বাহন ক্রয়ে ব্যয়াধিক্য যোগ। অন্যের অবিধিপূর্বক আচরণে স্বীয় মতাদর্শের সমর্থন। ভ্রমণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আত্মীয় স্বজনদের প্রশংসা প্রাপ্তি।

কুম্ভ ঃ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, মননশীলতা ও সামাজিক সুখতায় আত্মীয়জ্ঞানে সমাজসেবা। গৃহসংক্রান্ত জটিলতা ও পিতৃস্থানীয়ের শারীরিক ক্লেশ মনকষ্টের কারণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে স্নেহভাজনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়, বিলাস ও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণে রমণীর নিকট সান্নিধ্য।

মীন ঃ পারিবারের কোনো সদস্যের বিরূপ আচরণ ও কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি না রাখলেও সমালোচনা, তির্যক মন্তব্য ভেসে আসবে। অযাচিত উপকার বর্জন করা শ্রেয়। চিন্তার স্বচ্ছতা, সুন্দর যুক্তি শাস্ত্রে ও সংস্কৃতি মনস্কতায় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর, আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য